॥ জমাট অন্ধকার থেকে যিনি আমাকে আলোর রাজত্বে এনেছেন, অনেক দূরের দেশের মানুষ হয়ে আজও যিনি সব সময় আমার হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে রয়েছেন সেই ৺সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম আমার "অবতার" ॥

॥ নাট্যকারের অন্যান্য নাটক ॥

॥ মরুর কান্না

॥ পাশের ঘরের ভাড়াটে (২য় সং যন্ত্রস্থ)

॥ অচল টাকা চলছে

॥ পাথরের চোখ

॥ কালোমানুষ

॥ বেসরকারী জামাই

॥ রং-বেরং

॥ সম্রাটের মৃত্যু (২য় সং)

॥ কাগজের নৌকো

॥ আগ্নেয়গিরি (যন্ত্রস্থ)

॥ কাঠের পুতুল (যন্ত্রস্থ)

॥ ভূমিকম্প (যন্ত্রস্থ)

॥ ধুতরো ফুলের মালা (যন্ত্রস্থ)

॥ সোনার হরিণ (যন্ত্রস্থ)

॥ দু-চার কথা ॥

একটি আশ্রম। একটি মানুষ। একটি জিজ্ঞাসা। একটি কাহিনী। একটি কল্পনা। একটি নাটক। একটি নাম। অবতার।

মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, 'অবতার' কাল্পনিক নাটক। কোন ব্যক্তি, কোন ধর্ম, কোন শ্রেণী, কোন সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সমালোচনা করবার জন্ম অবতার লেখা হয়নি। তবু যদি কেউ অকারণে আঘাত পান "অবতার" পড়ে বা দেখে তাঁর কাছে গোড়াতেই আমি ক্ষমা চেয়ে রাখলাম।

মানুষকে আমি ভালোবাসি। চেনা-অচেনা-কাছের-দূরের-সুন্দর-কুৎসিত-জ্ঞানী-দার্শনিক-মূর্খ-রোগগ্রস্থ-বিকারগ্রস্থ-উন্মাদ-পঙ্গু, যেই হোক না কেন—আমি তাকে গভীরভাবে-ভালোবাসি। 'অবতার' নাটকে এসে ভীড় করেছে এমনি কয়েকজন মানুষ। কতো রাতে এরা আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে, কতো ভ্রমণের সময় হঠাৎ এসে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে, কতো অবসর সময়ে এদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, গল্প করেছি, কতো সময় এরা আমাকে মুগ্ধ-বিস্মিত-স্তম্ভিত-রোমাঞ্চিত করেছে, কতো সময়ে করেছে অশান্ত। এরা আমার সঙ্গী, আমার আত্মীয়—এ অধিকার আমার ওপর তাদের আছে বলেই তারা সময়ে-অসময়ে এসেছে। এসে জানা-অজানা সব কথা অকপটে খুলে বলেছে আমাকে। এদের নিয়েই এ নাটক।

পত্রাতু থেকে লাতেহার যাবার পথে ট্রেনে বসে আমার হাজারীবাগের দাদা মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে এদের কথা গুছিয়ে বললাম। শুনে লাফিয়ে উঠে মানুদা বললেন—'জোড়া লাগিয়ে এক করো এদের—দিয়ে দাও একটা নাম।' পত্রাতু থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্টের রাশিয়ান হোস্টেলে, খসড়াকে জোড়া লাগিয়ে নাম দিলাম—'অবতার'। খসড়াকে নাটক করি বসে এসে আমার চেতুরের ফ্ল্যাটে। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হিতাকাঙ্ক্ষী সমালোচক বন্ধের

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (মিঠুদা) 'অবতার' প্রথম পড়ে শোনাই বন্ধের যাদবের ফ্ল্যাটে এসে। সুচিন্তিত মতামত জানিয়ে আমাকে অনেক সাহায্য করলেন মিঠুদা। 'অবতার'-এর সর্বশেষ সম্পাদনা করলাম কলকাতায় এসে নিজের ঘরে বসে। এ কাজে বরাবরের মতোই আমার একমাত্র সঙ্গী কোলো উদীয়মান তরুণ কবি ও নাট্যকার চঞ্চল ভট্টাচার্য। বিশেষভাবে সাহায্য করলেন প্রখ্যাত শিল্পী রবীন নাথ ও শক্তিমান নাট্যনির্দেশক গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের সকলের কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম আমি। শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়, রঘুবীর নাদকার্নী ও মগনলাল বাগরীকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সাহিত্য জীবনের শুরু থেকেই শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক-সমালোচক প্রবোধবন্ধু অধিকারীর কাছে আমি উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়ে আসছি। আমার এই নতুন নাটক প্রকাশের দিনে তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক-সমালোচক নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে যাঁর কাছে থেকে পেয়ে আসছি আমি সুচিন্তিত অমূল্য উপদেশ।

'অবতার' লেখা শেষ হলো। এবার প্রকাশের পালা। আগ্রহের সঙ্গে 'লিপিকা'র শ্রীযুক্ত শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী 'অবতার' প্রকাশের, সেই সঙ্গে প্রচারের ভার নিয়েছেন। তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ রইলাম আমি।

এবার 'অবতার' প্রযোজনার কথা। কোন নাটকের সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ পায় সেই নাটকের মঞ্চাভিনয়ের ভেতর দিয়েই। নাটককে রসোত্তীর্ণ করবার কৃতিত্ব তাই শিল্পীদের—কৃতিত্ব নির্দেশকের—কৃতিত্ব নেপথ্যের কর্মীদের অভিনেতাদের, নির্দেশকের এবং নাট্যকারের ভাবনা ও চিন্তাধারার মধ্যে যদি সঙ্গতি ও সমন্বয় হয় তাহলেই নাটক জমে ওঠে। এ নাটকের রূপ রস-গতি-প্রকৃতি-ভাব-ব্যঞ্জনা-ছন্দ-বক্তব্য যে কোন শক্তিমান নির্দেশক অনায়াসেই ধরতে পারবেন। আলোক নিয়ন্ত্রণ, দৃশ্যসজ্জা, গতিবিন্যাস ও নেপথ্য সঙ্গীতের দিকে সামান্য দৃষ্টি রেখে অর্থাৎ স্বাভাবিকতা পুরোপুরি বজায় রেখে যদি তিনি নির্দেশ

দিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে শিল্পীদের দলগত অভিনয়ের দিকে বিশেষভাবে নজর রাখেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি উপস্থিত দর্শককে প্রচুর আনন্দ দিতে সক্ষম হবেন। অনেক নিরস নাটকও শক্তিমান নির্দেশক ও শিল্পীরা রসোত্তীর্ণ করে তুলতে পারে। আসল জিনিস রসসৃষ্টি—সৌন্দর্যসৃষ্টি। এর জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমার অনুমতি ছাড়াই নাটকের পরিবর্তন পরিবর্জন ও পরিবর্ধন তিনি করতে পারেন। একটা কথা শুধু মনে রাখতে হবে, উপস্থিত দর্শক যেন উদগ্রীব হয়ে গোটা নাটকটা দেখে। দেখতে দেখতে যেন তাদের মধ্যে একটা তীব্র আলোড়ন অনুভূত হয়। তাহলেই নাটক সার্থক—নাট্যকার সার্থক—নির্দেশক সার্থক—শিল্পীরা সার্থক—নেপথ্যের কর্মীরা সার্থক—প্রযোজনা সার্থক।

তথাকথিত নাট্যকার আমি। কথার পিঠে কথা সাজিয়ে এক একখানা নাটক তৈরী করি। আশা, একদিন হয়তো একখানা নাটক লিখতে পারবো—যে নাটক নাট্যকার শচীন ভট্টাচার্যকে দেবে সত্যিকারের নাট্যকারের স্বীকৃতি। আমার নাটক 'অবতার' 'নাটক' হোলো কি না সে বিচার করবার ভার চিন্তাশীল সমালোচকের ওপর তুলে দিলাম। তাঁদের সুচিন্তিত মতামত আমি মেনে নেবো। নাটক ভালো কি খারাপ সে বিচারের দায়িত্ব দেওয়া রইলো হৃদয়বান দর্শকের ওপর। অভিনয় শেষে তাঁদের বিচারের রায় মাথা পেতে নেবো।

অত্যন্ত খুশী হবো যে সকল সংস্থা আমার এ নাটকের অভিনয় করবেন তাঁরা যদি অনুগ্রহ করে এবং সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার করে আমার নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন একখানা মাত্র আমন্ত্রণ-লিপি আর কিছুই নয়।

শ্রীশচীন ভট্টাচার্য

৪২ বি, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

॥ চরিত্র লিপি ॥

পুরুষ ॥ দেবব্রত গোস্বামী ॥ চুম্‌কি ॥ মানকে ॥ শঙ্কর মিত্র ॥ গৌতম ॥ অবিনাশ পণ্ডিত ॥ বিক্রম লাহিড়ী ॥ শতদল ॥ চম্পক রায় ॥ প্রবাল গুপ্ত ॥ অমূল্য ঘোষ ॥ বানোয়ারীলাল আগরওয়াল ॥ সুব্রত রায় ॥ মহেন্দ্রলাল নাগচৌধুরী ॥ অমিয় মুখোপাধ্যায় ॥ যতীন ঘোষ ॥ নির্মল গুহ ॥ সঞ্জীব ভট্টাচার্য ॥ চৈতন্য তালুকদার ॥ হিরণ্ময় সান্যাল ॥

নারী ॥ শুভ্রা ॥ রশ্মি ॥ অজন্তা ॥ শ্রাবণী ॥

॥ দৃশ্য ॥

এক ॥ আশ্রমে গুরুদেবের ঘর ॥

দুই ॥ আশ্রমে গৌতমের ঘর ॥

তিন ॥ বিক্রম লাহিড়ীর বাইরের ঘর ॥

চার ॥ প্রবাল গুপ্তের পড়বার ঘর ॥

অবতার

॥ কথারম্ভ ॥

[কোলকাতা শহরের দক্ষিণপ্রান্তে বেশ পুরোনো একটি একতলা বাড়ির প্রায় অন্ধকার একখানা ঘরে 'অবতার' নাটকের শুরু। আশে-পাশের লোকেরা এ বাড়ির নাম দিয়েছে 'ক্ষ্যাপাগুরুর ধর্মশালা'। তুটো জানলা আর বাইরের দরজাটা দিয়ে বাইরের রাস্তার বেশ কিছুটা আলো এসে ঘরে ঢুকেছে। সেই আবছা আলোয় দেখতে পাওয়া যায় ঘরের মাঝখানে রাখা ছোট একখানা খাটে বসে আছেন এককালের অনেকের গুরুদেব আনন্দ গোস্বামী—বর্তমানের আধপাগলা এক বুড়ো। ভেতরের দরজায় সামনে একটা টুলে বসে আছে তাঁর যৌবনের বন্ধু শঙ্কর মিত্রের স্ত্রী শুভ্রা। মাথার সামনে একটা টুলে বসে আছে পুলিস অফিসার প্রবাল গুপ্তের স্ত্রী শ্রাবণী। খাটের চাদর কালো, বালিশের আচ্ছাদন কালো, টুল তিনটির রংও কালো। কারো মুখে কোন কথা নেই। কথা না বলে একসঙ্গে থাকবার সুখটুকু এরা সবাই যেন উপভোগ করছে। বাইরে একটা গাড়ি এসে থামবার শব্দ পাওয়া যায়। একটু বাদে বাইরের দরজায় বাদামী রং-এর স্যুট পরে এসে দাঁড়াতে দেখা যায় প্রবাল গুপ্তকে। নীরবে হাত তুলে গুরুদেবকে প্রণাম করে প্রবাল। শ্রাবণী একবার গুরুদেব আর একবার প্রবালের দিকে তাকিয়ে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। নিঃশব্দে দূর থেকে হাতজোড় করে প্রণাম জানিয়ে ধীর শান্ত গলায় শ্রাবণী বলে]

শ্রাবণী : আজ আসি গুরুদেব।

[সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়েন আনন্দ গোস্বামী। শান্ত পদক্ষেপে প্রবালের সঙ্গে চলে যায় শ্রাবণী। বাইরে গাড়ি ছাড়বার শব্দ পাওয়া গেলো। কিছুক্ষণ কেটে যায়। বাইরে থেকে অদ্ভুত গলায় গান গাইতে গাইতে ঘরে এসে ঢোকে

চুম্‌কি। কুষ্ঠ ভিখিরী চুম্‌কি আজকাল আনন্দ গোস্বামীর সঙ্গী—ক্ষ্যাপাগুরুর ধর্মশালার একজন।]

চুমকি : কালীঘাটের কালী তুমি মা…মা…মা…

গুরু : চুম্‌কি ?

চুম্‌কি : বাবা ?

গুরু : কতো পেলি আজ ?

চুম্‌কি : কাঁচকলা বাবা।

গুরু : কাঁচকলা !

চুম্‌কি : হ্যাঁ বাবা, কাঁচকলা নয়তো কি ? সব মিলিয়ে মাত্তোর সাতাশি পয়সা। কাল থেকে বাবা কালীঘাটে বসবো—গ্যাঁড়াকলের কারবার বাবা সেখানে—অনেক ধরে-কয়ে ব্যবস্থাও করে এসেছি—কাল থেকে জয় মা কালী বলে বসে পড়বো।

গুরু : এতোদিনের পুরোনো জায়গাটা ছেড়ে দিবি ?

চুম্‌কি : এখানে বসে পেট যে শুকিয়ে আমসত্তো হয়ে যাচ্ছে বাবা। ছোটো একটা পয়সা ছুঁড়ে দেবার আগে সব শালা আজকাল সাতবার ভাবতে শুরু করে দিয়েছে—দুটো টাকা পুরো না হলে শুধু জল-হাওয়া খেয়ে আর কদিন লড়বো বাবা ?

গুরু : নতুন জায়গায় দুটাকা জুটবে ?

চুমকি : হ্যাঁ বাবা, স্থান-মাহিত্তি আছে না—ঠিক জুটবে। একটু বেশী চেঁচাতে হবে মা-মা করে—নগদা চার আনা দিয়ে একটা গানও কিনে এনেছি বাবা।

গুরু : গান কিনেছিস !

চুম্‌কি : হ্যাঁ বাবা, এক ব্যাটা ভজা কালীঘাটে বসবে বলে কোথ্‌থেকে একটা গান জোগাড় করেছিলো—আর বসেনি—ধরলাম তাকে—সে ব্যাটা আবার অ্যাদ্দিনে চার লাইন বাদে গানের সবটা হজম করে ফেলেছে—সেই চার

লাইন শিখিয়ে দিয়ে চার আনা নিলো—ব্যাটা রামধড়িবাজ—চার লাইনই আমার ভালো বাবা—বেশী বললে পেটে লাথি মেরে হয়তো দুচার টাকা নিয়ে ছাড়তো—ঐ চার লাইনই গাইবো—চোখ দিয়ে জল ঝরাবো—ঝপাঝপ পয়সা পড়বে—গাইবো একবার, শুনবে বাবা ?

গুরু : শোনা।

[নাক টেনে টেনে কান্নাজড়ানো গলায়-অদ্ভুত সুরে গান গায় চুম্‌কি]

চুম্‌কি : কালীঘাটের কালী তুমি মা…মা…মা

জাত বেনে সেজেছো,

হাজার গণ্ডা পাণ্ডা নিয়ে

বেড়ে কারবার ফেঁদেছো।

—কেমন লাগলো বাবা ?

গুরু : ভালো। আর নেই ?

চুম্‌কি : না বাবা, চার আনার চার লাইন।

গুরু : ও:। হাতপায়ের যন্ত্রণাটা কমেছে ?

চুম্‌কি : হ্যাঁ বাবা, একটু কম। বিশ-বিশটে আঙুল দিয়ে শালা ভগমান এক-এক করে সব কটাই তো খসিয়ে নিলো, এবার পেটটাকেও খসিয়ে নিলে বড্‌ডো আরাম পাই বাবা। বাবা—

গুরু : কিরে ?

চুম্‌কি : সকালের হালুয়া কচুরির পয়সা আজ বাঁচিয়ে রেখেছি বাবা।

গুরু : রাতে বেঁচে থাকলে সকালে খাবার চিন্তা করিস। যা, শুয়ে পড় গিয়ে।

চুম্‌কি : হ্যাঁ বাবা, কাল খুউব ভোরে উঠতে হবে।

[চুম্‌কি ভেতরে চলে গেলে শুভ্রা উঠে এসে গুরুদেবের মাথার কাছে বসে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে শান্ত গলায় বলে]

শুভ্রা : ঘুমোবেন না একটু ?

গুরু : অ্যাঁ।

শুভ্রা : একটু ঘুমোন। এমনি করে দিনের পর দিন রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে শরীরটাকে শেষ করে কি লাভটা হচ্ছে আপনার ?

গুরু : ঘুমোবো শুভ্রা, একেবারেই ঘুমোবো—যতদিন বেঁচে আছি, যতক্ষণ বেঁচে আছি জেগে অতীতের স্বপ্ন দেখতে চাই—কি সুন্দর কিংবা কুৎসিত কি মধুর কি বীভৎস ছবি সব—এক এক করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে—শুভ্রা—

শুভ্রা : বলুন ?

গুরু : অতীতের আমি আজ মৃত—সবাই এক এক করে ভুলেছে আমাকে—সবাই ছেড়ে চলে গেছে—শ্রাবণীও যাবে—তুমি শঙ্কর আজও পড়ে আছো কেন এই নোংরা দুর্গন্ধের মধ্যে ?

শুভ্রা : আমি আছি আমার খুশি, শঙ্কর আছে শঙ্করের খুশি।

গুরু : কিন্তু এখানে থাকলে এখানে যারা আছে তাদের সকলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে থাকতে হবে যে! এখানে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে অথচ ওদের ঘৃণা করবে—

শুভ্রা : করবো—করবো—করবো—সকলকে ঘৃণা করবো তবু আপনাকে ছেড়ে কোথ্থাও যাবো না আমি—শঙ্কর খাপ খাইয়ে নিয়ে আছে, আমি খাপ না খাইয়ে নিয়ে পড়ে থাকবো, পারবেন আপনি আমায় এখান থেকে তাড়াতে ?

[মানকে এসে দাঁড়িয়েছে বাইরের দরজায়। পকেটমার মাতাল মানকে আজ ক্ষ্যাপাগুরুর ধর্মশালায় একজন স্থায়ী বাসিন্দা।]

মানকে : বাবা! বাবা।

গুরু : বল।

মানকে : মুখটায় তোমার হাতখানা একবার বুলিয়ে দেবে ?

গুরু : কেনরে! কি হয়েছে ?

মানকে : ভদ্রলোকের বাচ্চারা মুখটা আজ ফাটিয়ে ছেড়েছে বাবা।

গুরু : আয়—আয়—দেখি।

[কাছে এসে তার মুখে হাত বুলিয়ে দেন গুরুদেব ।]

—ইস্—ইস্, খুউব লেগেছে আজ, নারে ?

মান্‌কে : তা বাবা মিথ্যে বলি না তোমাকে, আজ একটু লেগেছে। একসঙ্গে ত্রিশটা লোক মিলে প্যাঁদানি দিতে আরম্ভ করলে একা আমি নিজেকে বাঁচাই কি করে বলো ? আঃ। না, আর ব্যথা নেই—একে পরপর দু'বোতল কালীমার্কা তার ওপর তোমার হাতের ছোঁয়ায় সব ব্যথা যন্ত্রণা চলে গেছে বাবা।

গুরু : কতো পেলি আজ ?

মান্‌কে : কচু বাবা।

গুরু : চুম্‌কি পাচ্ছে কাঁচকলা তুই পাচ্ছিস কচু -ব্যাপারটা কি ? লোকের এতো টাকা-পয়সা সব যাচ্ছে কোথায় ?

মান্‌কে : উড়ে।

গুরু : উড়ে !

মান্‌কে : হ্যাঁ বাবা, চাল কিন্‌তে গিয়েই সবাই ফতুর হয়ে যাচ্ছে—বাজার যাচ্ছে এক টাকা নিয়ে—অফিস যাচ্ছে শুধু গাড়িভাড়া নিয়ে—মাস-মাইনের দিন একটা হাত দিয়ে নিজের জানের চেয়ে বেশী সাবধানে নোটগুলো জাপটে ধরে বাড়ি ফেরে—কি করি বাবা বলে দাও। পুজো আসছে, দেখি ঐ সময়টায় যদি সারা বছরের রোজগারটা করে রাখতে পারি—তোমার আশীর্বাদে যদি পারি বাবা, তোমার কাছেই জমা করে দেবো—রোজ তিনটাকার একপয়সাও বেশী দেবে না—চেঁচামেচি করলেও নয়—মনে থাকবে ?

গুরু : থাকবে। যা গিয়ে শুয়ে পড়।

মান্‌কে : হ্যাঁ বাবা, হাতপাগুলো এখনো টনটন্ করছে—শুলেই নাক ডাকবে।

[মান্‌কে শুভ্রার দিকে তাকিয়ে হেসে ভেতরে চলে যায়। শুভ্রা জ্বলে ওঠে। বিরক্ত হয়ে বলে শুভ্রা]

শুভ্রা : একজনের শরীর পচছে, দুর্গন্ধ—আর একজনের সারা গায়ে সস্তা মদের দুর্গন্ধ।

গুরু : এরাই আমার বন্ধু, এরাই আমার সঙ্গী, এরাই আমার আত্মীয় আজ শুভ্রা। চুমকির শরীর পচে গন্ধ বেরুচ্ছে, আমার মন পচে সেখান থেকে যে অনেক বেশী দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে—মানকের মুখের দুর্গন্ধ কি আমার মাথার ভেতর থেকে যে বিষাক্ত দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে তার চেয়ে কম? তর্ক করো—জবাব দাও!

[গুরুদেব অশান্ত। বাইরে গাড়ি এসে দাঁড়ালো। সেই আবছা অন্ধকারেই বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সেশন জজ বিক্রম লাহিড়ী, সঙ্গে তার মেয়ে অজন্তা ও জামাতা চম্পক রায়]

চম্পক : এযে দেখছি পুরো অন্ধকার!

অজন্তা : লাইট নেই!

গুরু : এখানে অন্ধকারেরই রাজত্ব—কাকে চাই আপনাদের?

বিক্রম : গুরুদেব! গুরুদেব! আমি—আমি বিক্রম লাহিড়ী।

গুরু : বিক্রম লাহিড়ী! বিক্রম লাহিড়ী! ওঃ—লাহিড়ী!

বিক্রম : হ্যাঁ গুরুদেব।

[প্রণাম করতে অন্ধকারে এগিয়ে যায় বিক্রম লাহিড়ী। গুরুদেব তাকে বাধা দেন।]

গুরু : আমাকে ছুঁয়োনা লাহিড়ী—আমি অপবিত্র। কেন এসেছো বলো?

বিক্রম : আজ রাত তিনটের চম্পকের সঙ্গে অজন্তার বিয়ে—বিয়ের আগে আপনার পায়ের ধুলো নিতে ওরা ছুটে এসেছে—ওদের আপনি আশীর্বাদ করুন।

গুরু : আশীর্বাদ! আমি! আমি আশীর্বাদ করবো! আমার মতো তুমিও কি উন্মাদ হলে নাকি?

বিক্রম : গুরুদেব!

গুরু : আমাকে নরকের অন্ধকারেই থাকতে দাও লাহিড়ী, স্বর্গের প্রলোভন দেখাতে কেন এসেছো তুমি ? চলে যাও—চলে যাও এখান থেকে।

বিক্রম : না। আপনার আশীর্বাদ না পেলে এরা যাবে না—আমিও যাবো না।

[কেউ কোন কথা বলে না কয়েক মুহূর্ত। ঘরে একটা অবাঞ্ছিত নীরবতা।]

গুরু : আশীর্বাদ করবার অধিকার যে আমি হারিয়েছি লাহিড়ী—অভিশাপ—অভিশাপ দিতে পারি—নেবে ?

বিক্রম : তাই দিন—হ্যাঁ দিন, অভিশাপ—মাথা পেতে নেবে ওরা।

গুরু : বেশ, আমার তৈরী নরক থেকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি—পৃথিবীর যতো কিছু খারাপ, যতো কিছু কুৎসিত, যতো কিছু নোংরা—অনেক অনেক বছর ধরে একসঙ্গে থেকে ওরা দেখুক—খুশী ?

বিক্রম : খুউব খুশী। চলো, আর কোন ভয় নেই—গুরুদেবের আশীর্বাদ পেয়ে গেছি, আর কোন ভাবনা নেই—আমার প্রণাম রইলো গুরুদেব। দূর থেকে প্রণাম করো ওঁকে।

[বিক্রম অজন্তা ও চম্পক দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে চলে যাবার জন্য বাইরের দরজার দিকে এগুলে গুরুদেব বলেন]

গুরু : দাঁড়াও।

[তিনজনেই দাঁড়িয়ে পড়ে ।]

—আর কখনো এ নরকে এসো না—আমার অনুরোধ।

বিক্রম : গুরুদেবে !

গুরু : যাও—যাও।

[তিনজনেই চলে গেলে কৌতূহলী চুম্‌কি মান্‌কে এগিয়ে আসে।]

মান্‌কে : এরা কারা বাবা ?

গুরু : তুই চোর, চুম্‌কি ভিখিরী, এরা পাগল—বদ্ধ পাগল।

মান্‌কে : গুল্ দেবার জায়গা পাওনি—তোমার বড়লোক চেলা এরা না ?

চুম্‌কি : বিয়ে-বাড়ি থেকে আসছে—অনেক খাবার করেছে নিশ্চয়ই—মাংস পোলাও পায়েস দই রাব্‌ড়ি—ওঃ।

মান্‌কে : মেয়েটার গায়ে কত গয়না—ইস্‌!

গুরু : তোদের মাথা আর মুণ্ডু। কচু আর কাঁচকলা জোটাতে পারছে না, মিষ্টি-গয়নার স্বপ্ন দেখছে। দেখো শুভ্রা, দেখো অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছি আমি দুজনের নোলায় কেমন জল ঝরছে, দেখো একবার—যা ভাগ্‌, ভাগ্‌ এখান থেকে—

[গুরুদেবের ধমকানিতে দুজনে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়।]

—কতো সরল, কতো বোকা, কতো ভালো এরা শুভ্রা—এদের পায়ে মাথা রাখতে মন চায়।

শুভ্রা : রেখেছেন তো—বাকি আছে কিছু ?

গুরু : রেগো না শুভ্রা—বিবেকটাকে একবার জিজ্ঞেস করো ভালো করে—কি উত্তর পাও শুনি ?

শুভ্রা : আপনার মতো সেটাকে অনেকদিন আগেই যে বিষ খাইয়ে মেরেছি—উত্তর দেবার মত শক্তি কোথায় তার ?

গুরু : কি বললে। কি বললে তুমি ? বিষ! বিষ! শুভ্রা—শুভ্রা—

[হঠাৎ অশান্ত হয়ে উঠে আবার শান্ত হন আনন্দ গোস্বামী। ঘরের আবহাওয়া থমথমে।]

—শঙ্কর—শঙ্কর আসেনি ?

শুভ্রা : আজ হয়তো আসবে না।

গুরু : আসবে। সে আসবেই—তার আমার তোমার জায়গা যে একজায়গায়—না এসে যাবে কোথায় ?

[অদ্ভুতভাবে হাসেন আনন্দ গোস্বামী]

—তুমি যাও—ভেতরে যাও।

[দরজাটা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিয়ে ভেতরে চলে যায় শুভ্রা। ধীরে ধীরে

ঘরের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক অবাস্তব পরিবেশের। ভেজানো দরজাটা খুলে যায়। একটা আগুনের ঢেউ এসে ঘরে ঢোকে। খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন আনন্দ গোস্বামী। আগুনের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন তিনি। বিস্ফারিত চোখে তিনি দেখেন বাইরের দরজায় সবুজ আলোর ঝরনায় মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে রশ্মি। তার ঠোঁটের কোণে মিষ্টিমধুর হাসি।]

—কে! কে!

রশ্মি : আমি।

গুরু : কে আমি?

রশ্মি : রশ্মি।

গুরু : কি—কি চাস তুই এখানে? কেন—কেন এসেছিস?

রশ্মি : আশ্রয়।

গুরু : এটা আশ্রম নয়।

রশ্মি : একদিন তো ছিল?

গুরু : সে একদিনে আর আজে অনেক তফাৎ। একটা ক্যাপা বুড়ো, একটা পাগলী, একটা মাতাল, একটা কুষ্ঠ ভিখিরী, একটা পকেটমার থাকে এখানে—এ জায়গা তোর নয়!

রশ্মি : আমরা কি এদের দলে নই?

গুরু : আমরা! আমরা কারা?

রশ্মি : আমি—গৌতম।

গুরু : গৌতম! গৌতম। কোথায়? কোথায় সে?

রশ্মি : ঐ তো।

[রশ্মির ঠিক পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে গৌতম। তার ঠোঁটের কোণেও মিষ্টিমধুর হাসি। গুরুদেব অশান্ত হয়ে উঠেছেন।]

গুরু : দূর—দূর হয়ে যা তোরা এখান থেকে!

রশ্মি : কোথায় যাব বলে দিন?

[গুরুদেব চুপ করে থাকেন।]

—বেশ, যাচ্ছি আমরা।

[রশ্মি ও গৌতম দরজার দিকে এগুলে তীব্র কণ্ঠে গুরুদেব বলেন]

গুরু : না।

রশ্মি : কি না?

গুরু : যাবে না!

রশ্মি : যাবো না! থাকবো? আমরা থাকবো এখানে? গৌতম শুনছো গুরুদেব বলছেন—আমরা এখানে থাকবো—গুরুদেব রাজী হয়েছেন—আমরা থাকবো।

গুরু : হ্যাঁ থাকবে কিন্তু এক শর্তে।

রশ্মি : শর্ত।

গুরু—হ্যাঁ, নিজের নিজের বিবেকের সঙ্গে আগে তোমরা বোঝাপড়া করে নাও—তোমাদের বিবেককে জিজ্ঞেস করো—দয়ামায়া প্রেম ভালোবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি বিচার বিবেচনা সব ভুলে এই কসাইখানায় থাকতে পারবে কি না।

[রশ্মি ও গৌতম ইঙ্গিতে কথা বলে নিয়ে তারপর বলে।]

রশ্মি : পারবো।

গুরু : জেনে রেখো, একটুও আলো নেই এখানে—আলো আসবে না কখনো এখানে। দিনদুপুর সন্ধ্যে রাতে এখানে অন্ধকারের রাজত্ব—আমি অন্ধকারের রাজা—আমার হুকুম মেনে থাকতে রাজী আছো?

[রশ্মি ও গৌতম নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিয়ে উত্তর দেয়।]

রশ্মি : অন্ধকারেই থাকতে চাই আমরা—আলোকে আমরা ভয় করি।

গুরু : এখানে সুখ নেই, জ্বালা আছে—এটা সংসার নয়, হাসপাতাল—এটা স্বর্গ নয়, নরক।

[রশ্মি ও গৌতম আবার দুজনে কথা বলে ইঙ্গিতে।]

রশ্মি : আমরা এখানেই থাকবো।

গুরু : এসো তবে। বোসো।

[দুজনে ঘরের মাঝখানে এসে খাটে বসে। গুরুদেব ভেতরের দরজায় গিয়ে শুভ্রাকে ডাকেন]

—শুভ্রা ! শুভ্রা ! আলো—আলো—আলো আলো—রশ্মি—রশ্মি এসেছে—গৌতম এসেছে—আলো কোথায়—আলো |

[একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে মিলিয়ে গেলো রশ্মি ও গৌতম। শুভ্রা যখন এসে ভেতরের দরজায় দাঁড়ায় ঘরের অবাস্তব পরিবেশ তখন আর নেই। ঘরের সেই বাস্তব পরিবেশে উদ্‌ভ্রান্ত গুরুদেবকে ঐ অবস্থায় দেখে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয় শুভ্রা।]

—চলে গেছে—চলে গেছে শুভ্রা—ওরা এসেছিলো—এইখানে বসেছিলো —চলে গেলো।

শুভ্রা : কারা ? কারা এসেছিলো ?

গুরু : গৌতম-রশ্মি।

শুভ্রা—গৌতম ! রশ্মি !

[স্তব্ধ হয়ে যায় শুভ্রা। তার চোখের কোণে জলের রেখা।]

গুরু : আমি তাড়াইনি—বিশ্বাস করো—আমি বললাম থাব—থাক তোরা এখানে—ওরা রাজী হোলো—তোমাকে ডাকলাম—ওরা চলে গেলো। কেঁদোনা কেঁদোনা শুভ্রা—আসবে—ওরা আবার আসবে—ওদের সবাই রয়েছে এখানে—সবকিছু রয়েছে এখানে—ঠিক আসবে ওরা—ঠিক আসবে দেখো।

[খাটে গিয়ে বসে স্থিরদৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকেন আনন্দ গোস্বামী। আকণ্ঠ মদ গিলে ভেজানো দরজা ঠেলে হাসিমুখে বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে শঙ্কর মিত্র।]

শঙ্কর : এসে গেছি—এসে গেছি—কাকে আবার আসবার জন্ত বলছো ? নো,

আর কাউকে এখানে আর আনা চলবেনা—আর কেউ এখানে এসে থাকবার পারমিশান পাবে না—মাই অর্ডার—ধর্মশালার রাজা হাফ্ডেড—আমি মন্ত্রী—এখন আমার রাজত্ব—মাই অর্ডার—ধর্মশালার হাউসফুল—ঘুম পাচ্ছে—ভীষণ ঘুম পাচ্ছে—কাল সকালে—হাঁা কাল সকালে আমি দরজায় নো অ্যাডমিশান—প্রবেশ নিষেধ—বোর্ড ঝুলিয়ে দেবো। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড—দিস ইজ মাই কিংডম—মাই ডিয়ার ডিয়ার ওয়াইফ—আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? [মঞ্চে জমাট অন্ধকার নেমে আসে।]

॥ এক ॥

[অন্ধকার মঞ্চ আলোকিত হোলো। আধুনিক কায়দায় নিখুঁতভাবে সাজানো সেশন জজ বিক্রম লাহিড়ীর বাইরের ঘর। আসবাবপত্র বাদে। ঘরের দেওয়ালে একখানা মাত্র ফটো টাঙানো রয়েছে—সে ফটো বিক্রম লাহিড়ীর গুরুদেব আনন্দ গোস্বামীর। সোফায় বসে একটা জার্নালের পাতা ওল্টাচ্ছে বিক্রম লাহিড়ীর ছেলে শতদলের বন্ধু চম্পক রায়। চম্পক রায় ইঞ্জিনীয়ার। আর একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে একটা দর্শনের বইএর পাতা ওল্টাচ্ছে বিক্রম লাহিড়ীর মেয়ে অজন্তা। অজন্তাকে অসামান্যা সুন্দরীই বলা চলে। ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়ছে অজন্তা। ভেতর থেকে বাইরের ঘরে এসে ঢোকে শতদল। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে একটা বিরক্তির রেখা।]

শতদল : সবগুলো ঘরে গুরুদেবের ফটো টাঙাবার প্ল্যানটা কার ?

অজন্তা : কেন—কি হয়েছে ?

শতদল : হয়নিটা কি শুনি? ওপরে আমার ঘর হয়েছে গুরুদেবের পুজোর ঘর—আমার পড়বার ঘর হয়েছে গুরুদেব কবে এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন তার জন্য রিজার্ভড—সব ঘরের দেওয়ালে গুরুদেবের ফটো ঝুলছে—এমন কি আমার ঘর থেকে মায়ের ফটোটা অবদি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে—আই ওয়ান্ট্ টু নো হু ডিড্ দিস? এ উদ্ভট প্ল্যান কার মাথার ভেতর থেকে গজিয়েছে?

অজন্তা : অন্যায় কিছু করা হয়নি।

শতদল : ন্যায় অন্তু, ন্যায়-অন্যায়ের কথা উঠছে না—কে টাঙিয়েছে আমি শুধু জানতে চাইছি।

অজন্তা : আমরা।

শতদল : আমরা মানে?

অজন্তা : আমি বাবা—আমাদের গুরুদেব--

শতদল : আমার নয়।

অজন্তা : দাদা! বাবা শুনতে পেলে রাগ করবেন।

শতদল : মৃতদের হটিয়ে সব ঘরে জ্যান্ত একজনকে ঝুলিয়ে কার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হচ্ছে শুনি?

অজন্তা : তোমার অবজেকশান আছে নাকি?

শতদল : না—এ বাড়িতে আমার ওপিনিয়ানের ভ্যালু কতটুকু? বছরে মাত্র কটা দিন এসে তো থাকি আমি এ বাড়িতে—দিস ইজ নাথিং বাট এ হোটেল টু মি—আই নো আই অ্যাম্ আনওয়ানটেড হিয়ার—বাবার বাড়ি—তিনি তাঁর বাড়িটাকে যদি ছোটোখাটো একটা আশ্রম বানিয়ে তুলতে চান হোয়াই শুড্ আই অবজেকট্? বাট আই শুড্ সে, দিস ইজ্ টু মাচ্—আন্‌বেয়ারেবল্, ইন্‌টলারেবল্—পাওয়ার অফ্ অ্যাডজাস্টমেনট্ হ্যাজ কাম টু দি ব্রেকিং পয়েন্ট।

অজন্তা : এসব কথা মুখে আনতে তোমার আটকাচ্ছে না?

শতদল : কেন ? আটকাবে কেন ? অনেক গুরুর অনেক কেলেঙ্কারীর কথা আমার শোনা আছে।

অজন্তা : আমার শুনে লাভ নেই।

শতদল : আছে, ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে না, বুঝেছ ? বুড়ো হলে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান যে পুরোপুরি লোপ পায় এ আমার আগে জানা ছিলো না।

অজন্তা : দাদা !

শতদল : থাম্ তুই ! আচ্ছা চম্পক—

চম্পক : বলো ?

শতদল : লোকে গুরু কখন সাজে বলোতো ?

চম্পক : কখন ?

শতদল : সব লাইনে ফ্রাসট্রেটেড হয়ে।

চম্পক : ইজ ইট ?

শতদল : ইয়েস মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড—সব লাইনে ফ্রাসট্রেটেড হয়ে এই অদ্ভুত লাইনটি এরা বেছে নেয়—তারপর যারা অ্যামবিশাস—যারা একমপ্লিশড্ এস্টাব্লিশড্ তাদের মাথায় বসে কাঁঠাল ভাঙে আর খায়।

[অজন্তার বিশ্বাসে আঘাত লাগে, সে প্রতিবাদ জানায়।]

অজন্তা : দাদা !

শতদল : যা বলতে চাও বলে ফেলো।

অজন্তা : তুমি গুরুদেবকে অপমান করছো।

[মুখ দিয়ে "চু-চু-চু" শীৎকারধ্বনি করে কথা বলে শতদল]

শতদল : তোর গুরুদেব অনেক উঁচু ডালে বসে আছে আমার সাধ্যি নেই গাছে উঠেও তার নাগাল পাই—ওহে চম্পক, যদি সুখে থাকতে চাও তো এখন থেকেই আমার বোনটিকে সামলাও—একবার গেরুয়া পরে ফেললে আর ছাড়াতে পারবে না। 'গুরু গুরু' করে মাথাটি একেবারেই গেছে

দেখতে পাচ্ছো না? পড়াশুনো গান-বাজনা সবই তো ডকে উঠেছে—আচ্ছা, গুরু গুরু করে কি পাচ্ছিস তোরা বাংলাতো?

অজন্তা : মেনটাল পিস্।

শতদল : তার মানে মানসিক শান্তি?

অজন্তা : হ্যাঁ।

শতদল : থাক্, আর বেশী কিছু বলিসনি, মিটারের পারা চড়চড় করে বয়েলিং পয়েন্টের দিকে ছুটছে। চম্পক!

চম্পক : বলো?

শতদল : সুবল বোস ঘাটের গুরুকে মনে আছে?

চম্পক : সাধু সদানন্দ?

শতদল : হ্যাঁ, সদাই আনন্দে কাটাতেন যিনি তিনি সাধু সদানন্দ বটে।

অজন্তা : কি করেছেন তিনি?

শতদল : করেননি কি বল?

অজন্তা : কি করেছেন তুমিই বলোনা?

শতদল : গুরুগিরির সব কায়দাকানুন রপ্ত করে গুরুরপ চেলাদের ঘাড়ে বসে ভুড়ি দিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন। দামী দামী গাড়ি এসে তাঁর আশ্রমের দরজায় দাঁড়াতো - ডাক্তার, ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনীয়ার, আই. এ. এস. সব চেলা তার চরণামৃত খেয়ে ধন্য হোতো—সাধারণ মানুষ তার পায়ের ধুলো নেবার জন্য হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিতো—বড় বড় ঘরের সুন্দরী পরমাসুন্দরী মেয়ে বৌ বিধবার দল সব সময় তাঁর সেবা করতো—মানে চুটিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন সাধু সদানন্দ—হঠাৎ একদিন কি? পুলিস এসে হাজির—সাধু সদানন্দের হাতে লোহার হাতকড়া—বুঝলি?

অজন্তা : কেন?

শতদল : কেন? ওটি যে একটি 'আশ্রম'—আনঅথারাইজড্ প্রসটিটিউশান—ক্লিয়ার?

[কোন কথা না বলে অজন্তা চুপ করে থাকে।]

—আমাদের কলেজের অপজিটের গুরুকে তোমার মনে আছে? ধানবাদ থেকে এসেছিলো—ধরা যখন পড়লো তখন আর লেজ গুটিয়ে পালাবার পথ পায় না—এখানে আর পুলিস আসেনি, বুঝেছিস? পাড়ার ছেলেরাই গুরুদেবকে বেধড়ক ঠেঙিয়ে মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে কোলকাতা ছাড়িয়ে ছেড়েছিলো।

অজন্তা : এরা সব তো ফল্স্ গুরু!

শতদল : তোমার গুরুটিযে একেবারে নির্ভেজাল খাঁটি জিনিস যাচাই করে সার্টিফিকেট কে দিলো শুনি?

অজন্তা : তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না।

শতদল : আ-হা-হা রাগছিস কেন?

অজন্তা : চম্পক, তুমি চুপ করে বসে আছো, কিছু বলো?

শতদল : রাইট্, আমার বোনের গারজেন হবে তবে গুরুর এগেইনস্টে ব্রুচারটে বেফাঁস কথা বলে তাকে আঘাত দিয়েছি; উল্টো আঘাত দিয়ে তুমি ওকে সেভ করো—ইট ইজ ইয়োর ডিউটি। ঝটপট কিছু বলো—হ্যাঁ-হ্যাঁ বলো।

অজন্তা : দাদা!

শতদল : উঁহুহুহুঃ, তুমি নয় - ওকে বলতে দাও?

চম্পক : আমি কি বলবো? যার দর্শন তার কাছে—কাকাবাবু গুরুদেবকে শ্রদ্ধাভক্তি করছেন—নিশ্চয়ই তিনি কিছু পেয়েছেন—

শতদল : অনন্তুও পেয়েছে?

চম্পক : হয়তো পেয়েছে—এমন কিছু পেয়েছে যেটা তুমি বা আমি কীল্ করতে পারছি না—অবিশ্যি, তুমি যা বলছো সেটাও আমি অস্বীকার করছি না—তবে সত্যিকারের সৎসাধু জ্ঞানী দার্শনিক যে একেবারেই নেই সেটাই বা বিশ্বাস কি করে করি বল? দু একজন রিয়েল গুরু নিশ্চয়ই থাকতে পারেন।

শতদল : অনন্তুর গুরু সেই দু-একজনের একজন বলতে চাইছো তো তুমি ?

চম্পক : আমি সাইকোলজিস্ট নই—তবে এটুকু বলতে পারি রিয়েল গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে আপত্তি থাকা উচিত নয়—সমাজের কাঠামোটা তো গেছে—মানুষের মরাল বলতেও আজ আর কিছু নেই—সেখানে এঁরা যদি গাইড হয়ে নতুন পথের সন্ধান দিতে পারেন—

শতদল : আচ্ছা! তুমিও দেখছি এদেরই দলে ? গুরুদেবকে দেখেছো নাকি ?

চম্পক : তিনদিন আমি গেছি তাঁর আশ্রমে।

শতদল—বাঃ! বাঃ! বাঃ! তোমার ভাগ্যেও তাহলে তিনদিন বিশ্বরূপ দর্শন ঘটেছে ? কেমন দেখলে ?

চম্পক : সত্যিই আশ্চর্য মানুষ আনন্দ গোস্বামী।

শতদল : যাক্, গুরুদেব ঋষি না বলে মানুষ বলে যে ভদ্রলোককে স্বীকার করলে তার জন্য ধন্যবাদ। তারপর বলো কিরকম দেখলে ?

চম্পক : তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না শতদল কিন্তু গুরুদেব সত্যিই অদ্ভুত— কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁর—প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম হ্যাঁ, এক শনিবার —কাকাবাবু আমার পরিচয় দিলেন—আমি তাঁকে প্রণাম করলাম—তিনি আমার দিকে তাকালেন—এ ম্যান অফ্ স্ট্রেন্‌জ পারসোনালিটি—আমার মনে হলো যেন হাজার হাজার আগ্নেয়গিরির লাভা আমাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে—আমি পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না—আনন্দ গোস্বামী আমার পিঠে হাত রাখলেন—সঙ্গে সঙ্গে আমি নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেলাম—একটা হরর্—একটা রোমানস্—আই মিন টু সে—একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। আমি—

শতদল : তুমি একটা জার্মানী ফেরত বুদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার—মুহূর্তে ভেড়া বনে গেলে ? স্ট্রেনজ্!

চম্পক : সে সময়ের ফিলিংগস্ আমি তোমাকে ঠিক এক্সপ্রেস করতে পারবো না।

শতদল : করবার দরকার নেই—আমি বুঝে নিয়েছি।

চম্পক : কি বুঝলে ?

শতদল : তোমাকে হিপনোটাইজড্ করা হয়েছিলো।

চম্পক : কে করেছিলো ?

শতদল : তোমাদের গুরুদেব। এসব লাইনে আসতে গেলে ওমনি দুচারটে ছাগলবানানো বিদ্যে না জানলে কি এদের চলে ব্রাদার ?

চম্পক : অসম্ভব !

শতদল : অসম্ভবই সময় সময় সম্ভব হয়ে ওঠে ব্রাদার !

চম্পক : এ হতেই পারে না।

শতদল : হয়েছে—ইউ ওয়ার হিপনোটাইজড্ বাই গ্রেট্ গ্রেট্ গ্রেট্ গুরু আনন্দ ঋষি—বিশ্বরূপ দেখে ভড়কে গিয়েছিলে—শান্তরূপ দেখে শান্ত হয়েছো—মহাভারতের কৃষ্ণ নাম্বার ওয়ান ম্যাজিশিয়ান ছিলেন জানো তো ? [তার বিদ্রূপে অজন্তা জর্জরিত হয়ে উঠেছে।]

অজন্তা : দাদা !

শতদল : বলো !

অজন্তা : তোমায় রিকোয়েস্ট করছি গুরুদেবকে অপমান কোরো না।

চম্পক : গুরু মানে কি বলতে চাও তুমি তাহলে ? কে গুরু ?

শতদল : গুরু বলে কিছুতে আমি বিশ্বাস করি না—গুরু কথাটাতেই আমার আপত্তি। আমাদের সুপারস্টিশানগুলো কি জানো ? সোসাল ডিজিজ। গুরু আজকাল সো-কলড্ অ্যারিস্টোক্র্যাটদের একটা ফ্যাশান—একটা ডিজিজ—একটু শিক্ষিত একটু দর্শন জানে, একটু সাইকোলজি জানে, একটু পারসোনালিটি আছে, কিছু কিছু ম্যাজিক জানে এমনি একটা কিম্ভূতকিমাকার লোককে বেছে নিয়ে কিছু কিছু বাতিকগ্রস্ত ছিটগ্রস্ত লোককে প্রোপাগাণ্ডা পাবলিসিটি করে অসাধারণ করে তোলে—হাত-পা তুলে চেঁচিয়ে বেড়ায় গুরু বলে।

চম্পক : নিশ্চয়ই আনন্দ পাচ্ছে তারা ?

শতদল : হ্যাঁ, তা হয়তো পাচ্ছে তারা।

চম্পক : অ্যাডমিট করছো ?

শতদল : করছি।

চম্পক : যে আনন্দ পাচ্ছে বা আনন্দ করছে তাকে বাধা দেবার কোন রাইট তোমার নেই।

শতদল : আছে।

চম্পক : কেন ?

শতদল : এটা আনন্দের বিকৃতি—অন্ দ্যাট্ পয়েণ্ট আমার অবজেকশান্।

চম্পক : তুমি তাই ভাবছো—তারা সেটা ভাবছে না।

শতদল : সেইজন্তই তো আমার দুঃখ। গরু ভেড় ছাগলের দল একটা মানুষকে ঈশ্বর সাজিয়ে তার পায়ে মাথা রেখে স্বর্গে যাবার উদ্ভট কল্পনা করছে—ওয়াণ্ডারফুল !

অজন্তা : তুমি বলতে চাইছো আমরা সব গরু-ভেড়ার দলে ?

শতদল : কিছু বলছি না, সেনস্ অফ জাজমেন্ট যদি থাকে তাহলে নিজেই বুঝবে তুমি কি ?

অজন্তা : দাদা !

শতদল : ওয়ান পারসেনট্ কমনসেনসও যদি সত্যিকারের কারো থাকে তাহলে সে কখনোই কারো কাছে আনকনডিশানালি সারেনডার করে না—যদি কেউ করে, আই মাস্ট্ সে হি ইজ এ ফুল—ফ্রাসট্রেটেড্—এসকেপিস্ট—ম্যানিয়াক্—সিনাইল—পারভার্টেড্—ইডিয়েট—

[দুকান চেপে একরকম আর্তনাদ করে ওঠে অজন্তা।]

অজন্তা : দাদা !

শতদল : আশ্চর্য ! মানুষ যখন চাঁদে যাচ্ছে তখন এরা একটা মানুষকে গলায় মালা দিয়ে বেদিতে বসিয়ে তার চারপাশে ধূপধুনো দিয়ে ভগবান

সাজিয়ে তার পায়ের তলায় আফিংখোরের মতো পড়ে আছে—ইমপোটেণ্ট ভ্যাগাবনডের দল—আমার হাতে পাওয়ার থাকলে যতো গুরু সাধু আছে সবগুলোকে জেলে পুরতাম—যারা এদের নিয়ে নাচানাচি মাতামাতি করছে আর সুস্থ সমাজকে অসুস্থ করে গোল্লায় পাঠাচ্ছে তাদের জন্য বিরাট এক মেনটাল হসপিটাল খুলে সবগুলোকে সেখানে আটকে রাখতাম।

[অজন্তার চোখে জল এসে গেছে। ভেতরের দরজায় পর্দা সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকেছেন বিক্রম লাহিড়ী। অস্বাভাবিক রাগে তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তিনি শুনেছেন এদের কথাবার্তা। ঘরের আবহাওয়া থমথমে।]

বিক্রম : শতদল!

শতদল : বাবা!

বিক্রম : না। আনন্দ ঋষির শিষ্য বিক্রম লাহিড়ী এ বাড়ীর মালিক— এখানে দাঁড়িয়ে আমার বুদ্ধি আমার বিবেক যাঁকে গুরুদেব বলে স্বীকার করে নিয়েছে তাঁকে অপমান করবার অধিকার কে তোমাকে দিয়েছে?

শতদল : আমার কমনসেন্স। আমার কমনসেনস্ যেটা অন্যায় বোকামো পাগলামো ক্ষেপামো বলে ভেবেছে তাই বলেছে।

বিক্রম : আর তার জন্য তুমি দুঃখিত বা লজ্জিতও নয়?

শতদল : না।

বিক্রম : এটা তোমার কমনসেনসের গণ্ডীর বাইরের ব্যাপার মাই ডিয়ার সান্ —বুদ্ধি দিয়ে বিচার করবার জিনিস এটা নয়—হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার জিনিস—ফিলিংগস বলে কিছু আছে তোমার? আই অ্যাম ইয়োর ফাদার—আই হ্যাভ ব্রট ইউ ইন দিস ওয়ার্ল্ড—আই নো হু ইউ আর —হোয়াট ইউ আর। আই ক্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইয়োর স্ট্যাণ্ড-পয়েনট— ইউ হ্যাভ নো রাইট টু ইনটারফিয়ার ইন্ [illegible] অ্যাফেয়ার—আফটার অল উই আর ইনডিভিজুয়ালস্—

শতদল : আপনার সঙ্গে তর্ক করতে আমি চাই না—আপনি যা ইচ্ছে তাই করুন—তবে এ আমাকে বলতেই হবে—যেটা হচ্ছে সেটা বাড়াবাড়ি।

বিক্রম : শতদল তুমি ভুলে যাচ্ছো কার সঙ্গে কথা বলছো তুমি।

শতদল : আজ্ঞে না—আমি আনন্দ গোস্বামীর শিষ্য বিক্রম লাহিড়ীর সঙ্গে কথা বলছি—

বিক্রম : শতদল!

শতদল : একটা সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে তোলা অন্যায়—একজন মানুষকে ঈশ্বরের আসনে বসানো অপরাধ—বিকৃত আনন্দের মোহে একজনকে ঈশ্বর বানিয়ে তার কথায় ওঠবোস করা পাপ।

বিক্রম : তুমি উন্মাদ তাই এইসব কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারছো—তুমি নিজে বিকারগ্রস্ত তাই এইসব অবান্তর কথা ভাবতে পারছো—তুমি অন্ধ তাই সাদাকে কালো বলে আঁতকে উঠে ইঁদুরের গর্তে ঢুকে ইতর অভদ্র নাস্তিকের মতো চেঁচাচ্ছো।

শতদল : আমার স্বাধীন মত আমি প্রকাশ করতে পারবো না?

বিক্রম : কেন পারবে না? তার জন্য তোমার বন্ধের রাস্তা আছে, ময়দান আছে, ক্লাবরুম আছে, বার আছে—সেখানে—এখানে নয়।

শতদল : ইনডাইরেকটলি আপনি আমাকে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন—থ্যাঙ্কস্!

[ভেতরের দরজার দিকে এগোয় শতদল।]

বিক্রম : জাস্ট্ এ মোমেনট্—

শতদল : একস্‌কিউজ মি।

[শতদল ভেতরে চলে যায়।]

বিক্রম : টপ্ টু বটম্ মেটেরিয়ালিস্ট।

চম্পক : আপনি ফর নাথিং একসাইটেড হচ্ছেন কাকাবাবু—দু'চার জন ভণ্ড

গুরু ও দেখেছে—দু'চারজন উচ্ছৃঙ্খল অপদার্থ গুরুর কথা শুনেছে আর সেই বিশ্বাসকেই জেনারালাইজ করে বসে আছে।

বিক্রম : নট ছাট চম্পক—আই নো এভরিথিং—আই আনডারস্ট্যানড এভরিথিং—ও নিজে উচ্ছৃঙ্খল অপদার্থ হয়ে একজনের শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসকে অবজ্ঞা করবে—বেজলেস রিমার্ক পাস করবে—আমি তাই সহ্য করবো ভেবেছো? নেভার।

অজন্ত : দূর থেকে অবজ্ঞা করছে—একবার সামনে যাক না গুরুদেবের—দেখুক গুরুদেবকে—তাঁর সঙ্গে কথা বলুক—কিন্তু দাদা কি যাবে?

বিক্রম : না, যাবে না। গুরুদেবের পবিত্র আশ্রমে ওর মতো অপবিত্রের ঢুকবার কোন অধিকার নেই।

অজন্ত : দাদা—দাদা যদি বাড়ী ছেড়ে সত্যি সত্যিই চলে যায়?

বিক্রম : যাবে। যারা সত্যিকারের মহাপুরুষকে কথায় কথায় অপমান করে তারা মানুষ নয়—জানোয়ার—তাদের জায়গা সমাজে নয়, জঙ্গলে। আমি জানবো, আমার ছেলে ইনজিনিয়ার অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। বাজে সেনটিমেনটের জন্ত কোন প্রিনসিপল্ বিসর্জন দেবো মস্তিষ্কের এমন দীন অবস্থা আমার এখনো হয়নি।

[হঠাৎ চম্পকের দিকে তাকিয়ে অশান্ত গলায় বিক্রম লাহিড়ী বলেন]

—তুমি—তুমিতো গুরুদেবকে দেখেছো? তুমি অজন্ত নও। তোমার র‍্যাশনালটি রয়েছে—কি বলে তোমার রিজনিং—কি বলে তোমার ইনটেলেকট্? গুরুদেব প্রতারক—গুরুদেব চরিত্রহীন লম্পট জোচ্চোর? ভেদিক কালচার, উপনিষদ, গীতা, সিকস্ সিসটেম অফ্ ফিলজফি, থিওজোফির ওপর তার লেকচার তুমি শুনেছো—কি আইডিয়া হয়েছে তোমার—বি ফ্র্যাঙ্ক—বলো।

চম্পক : গুরুদেব সত্যিই অদ্ভুত।

বিক্রম : তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করা যায়?

চম্পক : যায়।

[একটা স্যুটকেস্ নিয়ে ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে শতদল।]

বিক্রম : শুনিয়ে দাও—তোমার কথাগুলো একবার তোমার বন্ধুকে শুনিয়ে দাও।

শতদল : থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্—আমার শুনবার দরকার নেই—আপনারাই শুনুন—গুরুদেবের বাণী টেপ্ রেকর্ড করে টুয়েনটিফোর আওয়ার্স শুনুন—মিথ্যে এক কল্পনার জগত গড়ে সে জগতে বাস করছেন আপনারা—বাস্তবের কিছু কিছু জট্পাকানো ধাঁধা বুঝতে কিছু সময় আপনাদের লাগবে।

বিক্রম : তোমার লেকচার বারে গিয়ে মদের গ্লাস হাতে দিয়ে তোমার মাতাল বন্ধুদের সামনে বসে দাও—হাততালি পাবে।

শতদল : মনে হয়, আপনার পরম পূজনীয় গুরুদেবও মাঝে মধ্যে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যকে দাবিয়ে রাখতে সামান্য সোমরস পান করেন।

বিক্রম : উইল ইউ প্লিজ লিভ দিস প্লেস ? এ বাড়ীর দরজা তোমার জন্য বন্ধ হোলো—ইয়েস্, ফর-এভার।

শতদল : আমার অপরাধ আমি কিছু অপ্রিয় সত্যিকথা বলেছি।

বিক্রম : আই সে গেট আউট্—ওয়ান ওয়ার্ড ফ্রম্ মাই লিপ্ ইজ্ নট সাফিশিয়েণ্ট ফর ইউ ?

শতদল : থ্যাঙ্কস্।

[সামান্য হেসে শতদল চলে যায়।]

বিক্রম : জানোয়ার ! জানোয়ার ! একটা জানোয়ারের জন্ম দিয়েছি আমি—হি হিজ্ ডেড্—আই অ্যাম হ্যাপী—রিয়েলি হ্যাপী।

[শতদল হঠাৎ বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়াতে অজন্তা চম্পক দুইজনেই অতি-মাত্রায় বিস্মিত দুঃখিত অনুতপ্ত। কিন্তু বিক্রম লাহিড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে কোন রকম প্রতিবাদ করবার মতো সাহস তাদের একজনেরও নেই। এক-

বার ঘরময় পায়চারী করে নিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ান বিক্রম লাহিড়ী। হঠাৎ ঘুরে অশান্ত উঁচু গলায় বলেন]

—ও ভেবেছে—ও ভেবেছে আমি অশিক্ষিত—বোকার মতো গুরুদেবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি—ও ভেবেছে ক্ষ্যাপা পাগলের মতো ঘর থেকে সমস্ত বিগ্রহ সরিয়ে একজন সাধারণ লোকের ফটোতে ফুল দিয়ে পুজো করছি—ওর ভাষায় শঙ্করাচার্য, মহাবীর, বুদ্ধ, জেশাস্ চৈতন্য, রামকৃষ্ণ সবাই ভণ্ড—সবাই প্রতারক—সবাই ম্যাজিশিয়ান—ওয়াণ্ডারফুল! স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন তোমরা? আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে তোমাদের? অ্যাম আই ম্যাড? অ্যাম আই ব্লাইনড? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? অ্যাম আই সারচিং ফর এ ব্ল্যাক্ বাটারফ্লাই ইন্ এ ডার্ক-রুম হোয়ার এ বাটারফ্লাই ইজ্ নট দেয়ার? চুপ করে আছো কেন—বলো? বলো, আমি অন্ধ—আমি তন্দ্রাগ্রস্ত—আমি উন্মাদ?

[ক্লান্ত উত্তেজিত অশান্ত বিক্রম লাহিড়ী। চম্পক-অজন্তা বোবাদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। কথা বলার ভাষা তারা খুঁজে পায় না। মঞ্চে অন্ধকারে নেমে আসে।]

॥ দুই ॥

[একটু একটু করে অন্ধকার মঞ্চ আলোকিত হয়। গুরুদেব আসবেন বলে বিক্রম লাহিড়ীর বাইরের ঘরের সামান্য কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে আজ। মাঝখানের দেওয়ালে টাঙানো গুরুদেবের ফটোতে মালা দেওয়া হয়েছে। তার ঠিক তলায় দেওয়ালে সেট্ করা হয়েছে দুটো ধূপদান। মাঝামাঝি

সাইজের একখানা জলচৌকি রাখা হয়েছে মাঝখানের দেওয়ালের গা ঘেঁষে। চৌকিতে পাতা হয়েছে একখানা ধবধবে সাদা চাদর। একটা তাকিয়াও রয়েছে গুরুদেবের হেলান দেবার জন্য। আর রয়েছে দুটো বড়ো সাদা ফুলদানী। ফুলদানীতে তাজা রজনীগন্ধার তোড়া। ঘরে রয়েছেন বিক্রম লাহিড়ী, চম্পক রায়, ধনী ব্যবসায়ী মহেন্দ্রলাল নাগচৌধুরী, ম্যাজিস্ট্রেট সুব্রত রায়, ইঞ্জিনিয়ার অমিয় মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার যতীন ঘোষ, ব্যারিস্টার নির্মল গুহ ও শ্রাবণী। ত্রিশের কাছাকাছি বয়েস হবে শ্রাবণীর। সে সুন্দরী কিন্তু কেমন যেন একটু উগ্র ফ্যাকাশে ধরনের। ঘরের সবাই উদগ্রীব হয়ে গুরুদেবের প্রতীক্ষা করছে। অজন্তা এসে ঘরে ঢোকে বাইরে থেকে। বিক্রম লাহিড়ী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন]

বিক্রম : এসেছেন? গুরুদেব এসেছেন?

অজন্তা : না। আমি যাচ্ছি বাবা, সাড়ে ছটা বেজে গেছে, ছটায় আসবেন বলেছেন—আধঘণ্টার ওপর হয়ে গেলো—চম্পক, তোমার গাড়ীটা একবার—

বিক্রম : তোমরা দুজনেই যাও।

[বিক্রম লাহিড়ী চম্পকের দিকে তাকাল। চম্পক উঠে দাঁড়ায়।]

মহেন্দ্র : সেই ভালো, একবার ঘুরেই এসো—এতো দেরী হচ্ছে যখন?

[চম্পক ও অজন্তা চলে যায়।]

অমিয় : সত্যি, এ রকম তো কখনো হয় না—আজ হঠাৎ—

নির্মল : কেউ এসে পড়েছেন হয়তো—আটকে গেছেন। আমি যখন এলাম বেদান্ত সংসদ-এর সেক্রেটারি তখনো বসে রয়েছেন।

অমিয় : কেন?

নির্মল : বেদান্তের উপর গুরুদেবকে ছ'টা লেকচার দিতে হবে ওদের সংসদ-ভবনে—কবে কবে গুরুদেবের সময় হবে সেই ডেট ঠিক করতে এসেছেন।

[অধ্যাপক সঞ্জীব ভট্টাচার্য এসে ঘরে ঢোকেন। সৌম্য প্রশান্ত সঞ্জীব ভট্টাচার্য, কথাও বলেন শান্ত ধীর গলায়।]

বিক্রম : গুরুদেবের ওখান থেকে আসছেন ?

সঞ্জীব : অ্যাঁ! হ্যাঁ। এখানেই আসছিলাম—ভাবলাম একবার আশ্রম ঘুরে যাই যদি গুরুদেব না গিয়ে থাকেন—রশ্মি বললো, গুরুদেব স্টাডিরুমে—লোভ সামলাতে না পেরে গুরুদেবের স্টাডিরুমের জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম—গুরুদেব ধ্যান করেছেন—অদ্ভুত একটা জ্যোতি বেরুচ্ছে—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম—কোথেকে যে সময় কেটে গেলো টেরই পেলাম না—আমার মনে হলো—আমার মনে হলো গুরুদেব যেন ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন—আমার ভেতর থেকে কে যেন হঠাৎ বলে উঠলো, আমার মতো সাধারণের ওখানে থাকা অপরাধ—আমি চমকে উঠলাম—পালিয়ে এলাম। অদ্ভুত! অদ্ভুত! সে সময়কার অনুভূতি মনে পড়লেই আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছি—অদ্ভুত!

[ঘরের আবহাওয়া থমথমে হয়ে যায়। সবাই নীরব।]

নির্মল : তাহলে তো আসতে অনেক দেরী হবে বলে হচ্ছে!

সঞ্জীব : তা হবে।

সুব্রত : গুরুদেব হয়তো আজকে এখানে আসবার কথা ভুলেই গেছেন।

বিক্রম : না-না, তা হতেই পারে না। আমার গাড়ী সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ড্রাইভার রয়েছে—দুবার আমি ফোন করেছি, গৌতম বলেছে একটু দেরী হতে পারে—গুরুদেব কথা দিয়েছেন আমাকে—ডেফিনেটলি আসবেন—জাস্ট এ মিনিট।

[বিক্রম ফোনের ডায়াল ঘোরায়।]

—হ্যালো—হ্যালো—কে ? রশ্মি ? আমি বিক্রম লাহিড়ী—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ-হ্যাঁ—কতো ? আচ্ছা-আচ্ছা—না-না-না—হ্যাঁ—আচ্ছা।

[ফোন রেখে এগিয়ে এসে বসতে বসতে বলেন]

—বললাম, চিন্তার কিছুই নেই—একটু দেরী হবে—কতো দেরী হবে ও কিছু বলতে পারলো না।

সুব্রত : কথা যখন দিয়েছেন গুরুদেব আসবেনই আসবেন। হ্যাট আই নো—কি রকম ঝড়-জলের মধ্যে গুরুদেব আমার ওখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন মনে আছে? আমরা কেউ কি ভাবতে পেরেছিলাম উনি আসবেন!

[প্রসঙ্গ পাল্‌টে কথা বলেন সুব্রত রায়]

—তারপর বলুন সঞ্জীববাবু, গুরুদেব ধ্যান করছেন—আপনি দেখে এলেন—ইউ আর রিয়েলি লাকি!

সঞ্জীব : আমার কি মনে হয় জানেন?

সুব্রত : বলুন।

সঞ্জীব : গুরুদেব যখন ধ্যান করেন ঈশ্বর ওর ওপর ভর করেন। আস্তে আস্তে কেমন একটা অদ্ভুত পরিবর্তন তাঁর হতে থাকে—চোখমুখের ভাব একেবারেই পালটে যায়—মনে হয় তিনি এক অন্য জগতের মানুষ—বিস্ময়কর এক সৌন্দর্যময় জগতের মানুষ।

মহেন্দ্র : অথচ আমাদের কতো কাছের মানুষ তিনি—প্রথম যেদিন আমি গুরুদেবকে দেখেছিলাম সেদিনের কথা আমি জীবনে ভুলতে পারবো না—গুরুদেব তাঁর পড়বার ঘর থেকে এসে সবেমাত্র বসবার ঘরে বসেছেন—ঘোর নাস্তিক আমি সেখানে বসে আছি—গুরুদেবকে একবার দেখবো—যাচাই করবো, তারপর ফিরে আসবো এই মনে মনে ঠিক করাই ছিলো—গুরুদেবকে প্রণামও করবো না প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলাম—গুরুদেব আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলেন—ওঃ! কি অদ্ভুত! কি অপূর্ব সে হাসি। সে হাসি আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে—শরীরটা আমার কেঁপে উঠলো—ভেতরে ভেতরে আমি কাঁপতে আরম্ভ করলাম—মনে সাহস এনে ভালো করে গুরুদেবকে দেখলাম—তাঁর চোখে চোখ রেখেই দেখলাম—

একটা উত্তেজনা আমাকে একেবারে অশান্ত করে ফেললো—আমার ভেতর থেকে সেই সময় কে যেন বলে উঠলো—এতোদিন ধরে যা চাইছিস তুই—যাঁকে চাইছিস—সামনে রয়েছে তোর—জড়িয়ে ধর—জড়িয়ে ধর ওঁর পা—মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেলাম আমি—আমার জড়তা, আমার তন্দ্রা, আমার অবিশ্বাস, আমার সন্দেহ সব কোথায় মিলিয়ে গেলো—জড়িয়ে ধরলাম গুরুদেবের দু'পা—গুরুদেব আবার হাসলেন—একটা হাত আমার মাথায় রাখলেন—আবার একটা ঝড় যেন আমার ভেতরটার সবকিছু ওলোট-পালোট করে দিলো—আমার মনে হোলো এমন একটা জিনিস আমি পেয়েছি যা আমার মনে প্রাণে শরীরে শান্তির প্রলেপের মতো জড়িয়ে আছে—আমার চাওয়ার পাত্র কানায় কানায় ভরে গেছে।

শ্রাবণী: আমার জীবনটাও ঠিক আপনারই মতো গুরুদেবকে পেয়ে ভরে উঠেছে—পথ হারিয়ে অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আমি—অন্ধকার থেকে আমায় আলোয় এনেছেন গুরুদেব—অশান্তি-অতৃপ্তির আগুন আমাকে ঘিরে ধরেছিলো—আজ আমি শান্ত-তৃপ্ত-সুখী। গুরুদেবের সঙ্গ—গুরুদেবের জ্ঞান—গুরুদেবের পাণ্ডিত্য আমায় নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে—আমি ধন্য।

অমিয়: সত্যি, থিওজফি, সাইকোলজি, ফিলজফি, পলিটিক্স্, পামিস্ট্রী, অ্যাসট্রোলজি, ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি, আর্ট, কালচার, সববিষয়ে একজন মানুষের যে এতো ভাস্ট নলেজ থাকতে পারে—থাকা সম্ভব, গুরুদেবকে জানাবার আগে আমার বিশ্বাসই হতো না।

বিক্রম: গীতা-চণ্ডীর নতুন যে ব্যাখ্যা গুরুদেব করেছেন—শুনেছেন? আই গুড্ সে—সুপার্ব!

সুব্রত: হিন্দু দর্শনে তাঁর যা জ্ঞান রয়েছে গোটা ভারতবর্ষে আর কারো ওমনি আছে কিনা আই ডাউট।

নির্মল: থেকেই বা কি হবে?

[নির্মলের কথায় ঘরের সবাই বিস্মিত ।]

বিক্রম : মানে !

নির্মল : পাগলের মতো শনিবার হলেই ছুটে আমি আসি কিসের নেশায় ? গুরুদেবের পায়ে মাথা রেখে ধন্য হবো—তাঁর বাণী শুনবো—সমস্ত ক্লেদ ক্লান্তি গ্লানি ভুলবো—কিন্তু যখনি চোখ বুজে দেশের অবস্থার কথা ভাবি—দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করি—ভয়ে ভাবনায় আতঙ্কে শিউরে উঠি—গোটা দেশ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে—সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়ে আজ এখানে কাল সেখানে জ্যালাজির মতো লুঠ-দাঙ্গা অরাজকতার সৃষ্টি হচ্ছে—সারাদেশ ধীরে ধীরে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—

[তাকে থামিয়ে কথা বলে ওঠে ডাক্তার ব্রতীন ঘোষ]

ব্রতীন : যাবে না ? গোটা সমাজটার রক্ত যে দূষিত হয়ে গেছে—এর প্রতিটি হাড়ে ক্রনিক্ অসটোমালাইটিস্ ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে—ক্যানসারে পচে গেছে এর সর্ব শরীর—দেশ জুড়ে হসপিটাল খুললেও ধ্বংসের হাত থেকে একে কেউ বাঁচাতে পারবে না—সমস্ত মন আমারও অসাড় হয়ে যায়—ভাবি গুরুদেব কেন অসময়ে এ দেশে জন্মালেন—

নির্মল : আমিও ঠিক ঐ কথাই বলতে চাই ডাক্তার—আমরা দু'চারজন যারা ঘটনাচক্রে তার সংস্পর্শে এসে গেছি শুধু সে ক'জন ছাড়া আর কে চেনে তাঁকে ? কে তাঁর মূল্য দেবে ?

ব্রতীন : কেউ দেবে না—নো বডি—দিতে পারবে না—ইচ্ অ্যানড এভরি ওয়ান ইজ করাপটেড—ইচ্ অ্যানড এভরি ওয়ান ইজ ইমমরাল—টোটাল ডেসট্রাকশানের আগে মনীষী-মহাপুরুষ-মহাত্মায় আর কেউ বিশ্বাস করবে না —নিজেদের দলেরই একজন ভেবে তাঁকে অস্বীকার করবে—অবজ্ঞা করবে —তাঁর দিকে ফিরেও তাকাবে না—সময় কোথায় ?

বিক্রম : তুমি দয়া করে থামো ডাক্তার।

ব্রতীন : কেন ? থামবো কেন ? দিস ইজ ফ্যাকট্‌—নো বডি ক্যান ডিনাই ইট্‌।

বিক্রম : তুমি ডাক্তার—ইতিহাসের কতোটুকু খবর রাখো তুমি ? ইতিহাসের পাতা উল্‌টে দেখো—ধ্বংসের মধ্যে—অরাজকতার মধ্যে—সন্ত্রাসের মধ্যেই দেশের লোক তার পথ দেখাবার মানুষকে খুঁজে বের করে নেয়—তারপর গোটা দেশ নতুনভাবে জেগে ওঠে—নতুন সমাজ—নতুন জীবন—নতুন স্বর্গ গড়ে ওঠে এমনি করেই—পথপ্রদর্শককে মাথায় তুলে এগিয়ে যায় দেশের প্রতিটি নাগরিক—তাঁকে অস্বীকার করে না—অবজ্ঞা করে না।

নির্মল : উইল ইউ প্লিজ মেক ইট ক্লিয়ার লাহিড়ী ?

বিক্রম : ওঃ শিওর।

নির্মল : আমার মনে হচ্ছে আমি যে কথা বলতে চাইছিলাম তুমিও ঠিক সেই কথাই বলতে চাইছো—বাট্‌ ইন এ রাউনড অ্যাবাউট্‌ ওয়ে—প্লিজ মেক ইট ক্লিয়ার !

বিক্রম : ঘোষের সঙ্গে আমি কিছুটা একমত। আই অলসো অ্যাডমিট্‌ ইচ অ্যানড এভরি ওয়ান ইজ করাপটেড—ইচ অ্যানড এভরি ওয়ান ইজ ইম্‌মরাল—কিন্তু সবাই ইম্‌মরাল সবাই করাপটেড বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে চেঁচালে আমাদের চলবে না—মৃত্যুর ঘণ্টা শুনে ভয়ে হার্টফেল করে মরে যারা তারা ক্লীব, তারা কাপুরুষ। দেশের সর্বত্র জঞ্জাল এতো আমরা জানি, আর জানি বলেই সেই জঞ্জাল আমরা পরিষ্কার করবো—নরক পরিষ্কার করে স্বর্গ আমাদেরই গড়তে হবে। দিস ইজ আওয়ার টাসক্‌—দিস ইজ আওয়ার মিশান।

সুব্রত : আমরা !

বিক্রম : হ্যাঁ।

মহেন্দ্র : কি করে ?

বিক্রম : গুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের সব জায়গায় আমরা ঘুরবো—প্রতিটি

বড়ো বড়ো শহরে আশ্রম তৈরী করবো—হাজার হাজার মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে গুরুদেবের বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করবো—গুরুদেব আমাদের আলো—আমাদের পথপ্রদর্শক—তাঁর চিন্তা—তাঁর দর্শন—তাঁর উপদেশ যদি সবাই শোনে তাহলে—আমি বলবো, আমাদের সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষের মনে চেনজ আসবেই আসবে।

নির্মল : ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল সাজেস্‌শান্‌!

অমিয়। কিন্তু গুরুদেব কি রাজী হবেন?

সঞ্জীব : ওঃ! গুরুদেব যদি রাজী হন—

নির্মল : হোয়াই নট? আফটার অল দিস্‌ ইজ এ রাইট আইডিয়া!

শ্রাবণী : আমি ভাবতে পারছি না—সত্যি আমি ভাবতেই পারছি না—গুরুদেব রাজী হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হবে—প্রত্যেকের মুখে হাসি ফুটবে—কিন্তু—

নির্মল : কিন্তু কি বলুন!

শ্রাবণী : গুরুদেব নিজেকে নিজের মধ্যে এমন ভাবো গুটিয়ে রেখেছেন তাতে তিনি রাজী হবেন বলে আমারও মনে হয় না।

বিক্রম : তিনি রাজী হয়েছেন।

[সকলের মুখে হাসি ও বিস্ময়ের ঢেউ খেলে যায়।]

—হ্যাঁ, তিনি রাজী হয়েছেন—আমাকে তিনি কথাও দিয়েছেন—আমরা জানি গুরুদেব দেশকে ভালোবাসেন—সমাজকে ভালোবাসেন মানুষকে ভালোবাসেন। তিনি আমার প্রোপোজাল শুনেই রাজী হয়েছেন।

নির্মল : তাহলে একটা প্রিলিমিনারী ডিসকাশান আজকেই করে নেওয়া যাক?

বিক্রম : আগামী রোববার তিনি সময়ও দিয়েছেন—আজ শুভ্রার জন্মদিন না হলে আজকেই—হোতো দিস ইজ ইন মাই মাইনড।

মহেন্দ্র : না-না, আসছে রোববার যখন তিনি সময় ঠিক করেছেন, রোবরাই হবে।

অমিয় : কিন্তু একটা কথা ?

বিক্রম : বলুন ?

অমিয় : আমাদের ক্ষমতা কতটুকু ? অনেকের সাহায্য না পেলে এতো-বড়ো একটা কাজ—মানে আমি বলতে চাইছি—

বিক্রম : আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড্ ইয়োর পয়েনট মুখার্জি, ইউ আর হানড্রেড পাসেনট্ রাইট্—এ কাজে সকলের সাহায্য প্রথমেই হয়তো আমরা পাবো না।

নির্মল : হয়তো কি ? সে কখনো পাওয়া যায় না—যাবেও না—সবাই যখন আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে—গুরুদেবের পারসোনালিটি যখন হাজার মানুষকে অ্যাট্রাকট্ করবে—সকলের মাথা যখন তার পায়ে নুইয়ে পড়বে কেবল তখনই আমরা সকলের সাহায্য পাবো—তার আগেকার যা কিছু করবার আমাদেরই করতে হবে।

[দ্রুত এসে ঘরে ঢোকে অজন্তা।]

অজন্তা : বাবা—বাবা গুরুদেব—গুরুদেব এসে গেছেন।

বিক্রম : এসে গেছেন ?

[একটা বেশ বড়োগোছের রূপোর থালার ওপর দুটো মালা ছিলো তাই নিয়ে বিক্রমের সঙ্গে দ্রুত বাইরে চলে যায় অজন্তা। ঘরের সবাই উঠে দাঁড়িয়ে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে গুরুদেবের দর্শন পাবার আশায়। সবাই ধীর সবাই শান্ত সবাই সংযত। বাইরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন গুরুদেব—সঙ্গে শুভ্রা, অজন্তা, বিক্রম ও চম্পক। গুরুদেবের গলায় অজন্তার দেওয়া মালা দুটো। সকলের মুখ দিয়ে একই সঙ্গে অস্ফুট-স্বরে বেরিয়ে আসে একটি মাত্র শব্দ।]

সকলে : গুরুদেব ! গুরুদেব !

[গুরুদেবের ঠোঁটের কোণে মিষ্টি মধুর হাসির রেখা ! সত্য শিব ও সুন্দরের প্রতীক্ষায় যেন গুরুদেব। তিনি অপূর্ব ! সিল্কের চাদর, সিল্কের কাপড়, সিল্কের বেনিয়ান ও সাদা চটি পরে এসেছেন গুরুদেব। তাঁর গলায় মুক্তোর মালা, হাতে আট আঙুলে আটটা হীরের আংটি। শুভ্রা এসেছে গরদের কাপড় পরে। শুভ্রার বয়েস পয়তাল্লিশ। যৌবনে সে যে অসামান্যা সুন্দরী ছিল—তার প্রমাণ আজও রয়েছে তার সর্বাঙ্গে, সে আজও অপূর্ব অপরূপা। গুরুদেব এসে দরজায় দাঁড়ালেই মঞ্চে অন্ধকারে নেমে আসে।]

॥ তিন ॥

[মঞ্চের আলো জ্বললো। কোলকাতা শহরের দক্ষিণপ্রান্তে গুরুদেবের আশ্রমের একখানা ঘর। গুরুদেবের বসবার ঘর একখানা। ঘরখানা বেশ বড়োই। বেদীতে বসে আছেন গুরুদেব। নিচে দামী কার্পেটের ওপর সাদা চাদর পাতা, তার ওপরে বসে আছে শুভ্রা, বিক্রম, অজন্তা, মহেন্দ্র সুব্রত, সঞ্জীব, ব্রতীন, নির্মল ও শ্রাবণী। আর আছে দুজন—গৌতম-রশ্মি। একটু কালো কিন্তু অস্বাভাবিক মিষ্টি মেয়ে রশ্মির বয়েস পঁচিশ হবে। ফুটন্ত যৌবনের ঢেউ দোলা খায় তার শরীরে। কবে কোন ছোট বেলায় গুরুদেবের এ আশ্রমে এসে সে তার জায়গা করে নিয়েছে। এ বাসা এ গুরুদেব ছাড়া সে খবর বোধ হয় আর কেউই জানে না। সাতাশ বছরের যুবক গৌতম শান্ত সৌন্দর্যের প্রতীক। ঈশ্বর মানুষকে কতো নিখুঁত কতো সুন্দর করে

গড়তে পারেন তার প্রমাণ শুভ্রার একমাত্র ছেলে—গৌতম। নিজের মনের মতো করে তাকে মানুষ করেছেন গুরুদেব। সানসক্রিট, এইনসেন্ট হিস্ট্রিকঅ্যাপ্লড্ কালচার ফিলজফি নিয়ে এম. এ. পাশ করেছে গৌতম। এ ছাড়াও তাঁকে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে শিক্ষিত করে তুলেছেন গুরুদেব। শুভ্রাকে দুজনেই মা বলে কিন্তু গুরুদেবকে দুজনেই বলে 'গুরুদেব।' ঘরে আরো দুজন নতুন মানুষ দেখতে পাওয়া যায়, একজন ইনকাম্ ট্যাক্সের প্লিডার-চৈতন্য তালুকদার আর একজন অর্ধোন্মাদ হিরণ্ময় সান্যাল। ধূপদানীতে ধূপ রয়েছে, ফুলদানীতে রয়েছে ফুলের তোড়া। বড়ো একটা রুপোর থালাতে রয়েছে ভর্তি সন্দেশ। মঞ্চ আলোকিত হবার আগে থেকেই চৈতন্য ও হিরণ্ময় ছাড়া ঘরের আর সবাই একই সঙ্গে 'গুরুদেব-গুরুদেব-গুরুদেব-গুরুদেব-গুরুদেব-গুরুদেব-গুরুদেব' বলে চলেছে সঙ্গীতের সুরে। 'গুরুদেব' সঙ্গীত ধীরে ধীরে নিচু থেকে অনেক উঁচুতে-উঠে আবার নিচুতে নামে এবং একসময় সমাপ্ত হয়। শুভ্রা সন্দেশের পাত্র-গুরুদেবের সামনে এগিয়ে দিলে গুরুদেব একটা মাত্র সন্দেশ নিয়ে মুখে দেন তারপর সকলকে দুটো চারটে করে দেন—সকলে এগিয়ে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করে সন্দেশ নিয়ে ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে কিছুটা খায় আর কিছুটা যত্নকরে নিজের কাছে রেখে দেয়। চৈতন্য, হিরণ্ময়, বিক্রম, অজন্তা, শুভ্রা, অমিয়, মহেন্দ্র, সুব্রত এবং গুরুদেব বাদে সবাই শান্ত পদক্ষেপে ঘর ছেড়ে চলে যায়। একটা দামী হীরের আংটি পকেট থেকে বের করে গুরুদেবকে দেবার জন্য এগিয়ে আসে সুব্রত রায়।]

গুরুদেব : কি ওটা ?

সুব্রত : সামান্য একটা আংটি গুরুদেব।

গুরু : সামান্য! [গুরুদেব একটু হেসে বলেন] কেন দিচ্ছ ?

সুব্রত : কিরীট সেলস সুপারভাইজার হয়েছে—আজকেই ট্রাঙ্ককল এসেছে—
কিরীটের মার ইচ্ছে—

গুরু : সে তার নিজের ক্ষমতায়-উন্নতি করেছে তার জন্য ওটা আমাকে কেন দিতে চাইছো ?

সুব্রত : আমি দিয়ে যদি আনন্দ পাই—আপনি নেবেন না ?

[সুব্রতর ব্যথা বুঝতে পেরে সামান্য-হেসে তিনি বলেন]।

গুরু : নিশ্চয়ই নেবো কিন্তু পরবোটা কোথায় ? সবকটা আঙুলেই তো হীরে দিয়ে ফাঁসে দিয়েছে। তোমরা—বড্ডো কষ্ট হয় যে রায় ?

[তার হাত থেকে আগ্রহের সংগে আংটি নিলেন গুরুদেব। খুশীতে উজ্জ্বল সুব্রতের চোখমুখ।]

দাও—পরবো। অনেক রাত হয়েছে—তোমাকে তো আবার অনেকটা পথ যেতে হবে ?

সুব্রত : হ্যাঁ গুরুদেব

গুরু :। এসো তাহলে

[গুরুদেবকে প্রণাম করে খুশী মনে চলে যায় সুব্রত রায়। উঠে কিছুটা সামনে এগিয়ে এসে কথা বলেন মহেন্দ্রলাল নাগ চৌধুরী।]

মহেন্দ্র : গুরুদেব ?

গুরু : বলো ?

মহেন্দ্র : দয়া করে আমার নিউ আলিপুরের নতুন বাড়ীতে একবার আপনার পায়ের ধুলো পড়লে ধন্য হবো। আমি নতুন বাড়ী করা থেকেই আমার মনে এ ইচ্ছেটা রয়েছে—আমারআত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলকে আমি বলেও রেখেছি। মালতী পক্ষাঘাতে পঙ্গু, উঠে চলতে হয়তো সে আর কোনদিনই পারবে না··· সে যে আপনাকে একবার দেখবার জন্য দিন গুণছে গুরুদেব !

[গুরুদেব সামান্য হাসেন।]

দয়া করে পূর্ণিমার দিন যদি—আমার অনেকদিনের ইচ্ছে গুরুদেব, হ্যাঁ আপনাকে বলতেই হবে।

[সামান্য হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়েন গুরুদেব।]

গুরু : যাবো চৌধুরী, যাবো। মালতীকে বলো, পায়ের ধুলো দিতে নয় আসছে পূর্ণিমার দিন তার নতুন বাড়ীতে তাকে আমি দেখতে যাবো. দয়া নয় চৌধুরী— এ আমার কর্তব্য—এতোদিন বলোনি কেন ;

মহেন্দ্র : আমি ধন্য—আমি ধন্য গুরুদেব—মৃত্যুনও ন'তারিখে অ্যামেরিকা থেকে এসে যাচ্ছে।

গুরু : ডকটেরেট্ হয়েছে ?

মহেন্দ্র : হ্যাঁ গুরুদেব, আপনার আশীর্বাদে ওর থিসিস্ সবাই অ্যাপ্রিশিয়েট্ করেছেন।

গুরু : আমার আশীর্বাদে নয় তার ক্ষমতায় সে তার যোগ্য সম্মান অর্জন করেছে—খুব খুশী হলাম। [প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায় মহেন্দ্র চৌধুরী।] এসো। [মহেন্দ্র চলে গেলে বিক্রমের দিকে তাকালেন গুরুদেব।] ইনি ?

[চৈতন্য গুরুদেবকে বিক্রমের ইঙ্গিতে প্রণাম করতে গেলে গুরুদেব বাধা দেন। বিক্রম বসে।]

বিক্রম : আমার বন্ধু গুরুদেব, ইনকামট্যাক্সের প্লিডার শ্রীচৈতন্য তালুকদার—আপনার কথা শুনে ও আজ আপনাকে দেখতে এসেছে। দয়া করে আপনি যদি ওকে দীক্ষা দেন—

[কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। গুরুদেব দেখেন চৈতন্যকে চৈতন্যই কথা বলে।]

চৈতন্য : দশ বছর ধরে একজন সত্যিকারের গুরু আমি খুঁজে বেড়িয়েছি—আজ আপনাকে দেখে সে আশা আমার পূর্ণ হয়েছে।

[কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে শান্ত গলায় গুরুদেব বলেন।]

গুরু : আপনি দীক্ষিত—দীক্ষা নেবার জন্য এখানে আসা আপনার উচিত হয়নি। [অতিমাত্রায় বিস্মিত চৈতন্য সামান্য ইতস্তত: করে কথা বলে।]

চৈতন্য : অ্যাঁ—হ্যাঁ—মানে—আজ থেকে বছর বারো আগে একজন ভণ্ডগুরুর কাছে আমি দীক্ষা নিয়েছিলাম—সে গুরু নয়, আস্ত একটি গর্দভ। তার খাদ্য, যতো সব অখাদ্য-কুখাদ্য—তার ব্যবহার চূড়ান্ত অভদ্র—তার পেশা,

হত রকমের প্রতারণা—তার নেশা যতো রাজ্যের ব্যভিচার—না জেনে আমি তার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলাম এতে যদি আপনি আমাকে দীক্ষিত বলেন তাহলে আমি স্বীকার করছি, আমি দীক্ষিত—কিন্তু না জেনে যে ভুল আমি করেছি—

গুরু : ভুল তো আবার করতে পারেন? আমিও গর্দভ হতে পারি—আমি কি খাই না খাই আপনি কখনো দেখেন নি—আমার নেশা ব্যভিচার, পেশা প্রতারণা কিনা তাও আপনি জানেন না—একবার একজনের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছেন—অন্য একজনের শোনা কথার ওপর বিশ্বাস করে এখানে এসেছেন—একদিন আমার ওপরও আপনি বিশ্বাস হারাতে পারেন—

[এগিয়ে এসে গুরুদেবের পা ধরতে যায় চৈতন্য। গুরুদেব ইঙ্গিতে বাধা দিলেন।] বলুন?

চৈতন্য : আমি বিশ্বাস হারাতে এখানে আসিনি গুরুদেব—বিশ্বাস করে শান্তি পাবো বলে এসেছি।

গুরু : উকিল মানুষ আপনি আমাকে ভালো করে দেখে নিন—দেখুন, আমাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা?

চৈতন্য : আমার অপরাধ নেবেন না গুরুদেব—বাংলা কথা আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারি না—বেফাঁস বলে ফেলি—অতি সাধারণ আমি—আমার অপরাধ—

গুরু : নিজেকে অন্যের চেয়ে ছোট করে দেখা বিনয় নয়, অপরাধ—ইনফিরিওরিটি কম্‌প্লেকস্ একটা ডিজিজ—মানসিক রোগ।

চৈতন্য : আমি সত্যিই রোগে ভুগছি গুরুদেব—সারা জীবন ধরে একটার পর একটা পাপ করে চলেছি—আমি পাপী। আপনি—

গুরু : আপনি সত্যিই পাপী। অতি সামান্য ব্যাপারে—অর্থকাতর হয়ে যারা নিজের আত্মাকে অপমান করে—ধিক্কার দেয়, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী পাপ তারাই করে। [মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে চৈতন্য।]

চৈতন্য : আমার সব দোষ আমি স্বীকার করছি গুরুদেব। আজ আপনার কাছে না এলে আমার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যেতো—হতাশ, নৈরাশ্য আর বিরক্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছি আমি, কিছু টাকা হয়তো আমার আছে কিন্তু একটুও সুখ নেই—আনন্দ কি ভুলেই গিয়েছিলাম—আজ-আমি অনুভব কচ্ছি আমি—আমি বুঝতে পারছি আমি আজ আনন্দিত—

গুরু : এখানে এসে আপনি আনন্দিত ?

চৈতন্য : হ্যাঁ গুরুদেব—আপনাকে দেখে, আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি আনন্দিত।

গুরু : কি দেখলেন আমার মধ্যে ?

চৈতন্য : ঈশ্বরকে। [সামান্য উত্তেজিত গলায় গুরুদেব বলেন।]

গুরু : ঈশ্বরকে অপমান করবেন না—আমি মানুষ—ঈশ্বরের হাতের পুতুল।

[ঘরের আবহাওয়া থমথমে। বিক্রম সামান্য ইতস্ততঃ করে বলে।]

বিক্রম : অত্যন্ত অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে গুরুদেব—ও অসহায়—ভীষণ অসহায় গুরুদেব—ওর সব কথা শুনলে ওর ওপর আপনার মায়া হবে। কি বরে যে ও—

[গুরুদেবের ইঙ্গিতে বিক্রম থেমে যায় : চৈতন্য বলে।]

চৈতন্য : পাপের মাত্রা আমার ছাড়িয়ে গেছে গুরুদেব— আমাকে দয়া করুন—আমি চরিত্রহীন লম্পট-পাষণ্ড—হাজার রকমের যন্ত্রণা অক্টোপাশের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরেছে—বিবেকের দংশন আমাকে সব সময় ক্ষত-বিক্ষত করেছে—শুধু একটু শান্তি চাই আমি— আর কিছুই নয়।

বিক্রম : ওকে আপনি দয়া করুন গুরুদেব—একবার ওকে দেখুন।

[গুরুদেব দেখেন চৈতন্যর চোখের কোণে জল। বোবা দৃষ্টিতে চৈতন্য তাকিয়ে রয়েছে গুরুদেবের দিকে। ঘরের আর সবাই নীরব দর্শক।]

গুরুদেব : পূর্ণিমার দিন চৌধুরীর বাড়ীতে ওঁকে নিয়ে এসো সঙ্গে করে।

বিক্রম : ওকে—ওকে আপনি দীক্ষা দেবেন! [গুরুদেব সামান্য হাসেন।]

চৈতন্য : গুরুদেব! গুরুদেব!

গুরু : আমি তো প্রফুল্ল ভট্টাচার্য নই—আপনার গুরুদেব এখনো হইনি।

চৈতন্য : আপনি! আপনি প্রফুল্ল ভট্টাচার্যের নাম কি করে জানলেন! লাহিড়ী—না লাহিড়ী তো জানে না—কেউ জানে না—কানপুরের চাকরীতে মিহির গুপ্তের বাড়ীতে দীক্ষা নিয়েছিলাম আমি—আপনি অন্তর্যামী গুরুদেব!

গুরু : মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর ঈশ্বর—আমি অভিনাবী ম্যাজিসিয়ান। লাহিড়ী—

বিক্রম : গুরুদেব!

গুরু : অনেক রাত হয়েছে, তুমিও এবার এসো।

[বিক্রম-অজন্তা-চৈতন্য গুরুদেবকে প্রণাম করে চলে যায়। ঘরে রইলো শুধু গুরুদেব, শুভ্রা, অমিয় ও হিরণ্ময় সান্যাল। গুরুদেব হিরণ্ময়ের দিকে তাকালেন। একটা কথাও না বলে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে এতক্ষণের এতো কিছুর সব দেখেছে হিরণ্ময়। গুরুদেব তার দিকে তাকালে সেও তাকিয়ে থাকে গুরুদেবের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে কথা বলে অমিয় মুখোপাধ্যায়।]

অমিয় : ওকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি গুরুদেব, সেদিন দেখলাম নিউ-মার্কেটের সামনে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে—আজ এখানে আসবার সময় দেখি মোমিনপুরের মোড়ে ফ্যালফ্যাল করে ট্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে কি দেখছে—গাড়ী থামিয়ে অনেকক্ষণ ওকে দেখলাম—তারপর এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলাম—কিছুতেই আসতে চায় না—তারপর আপনার কথা শুনে রাজী হলো—জানেন গুরুদেব, আমাদের ইয়ারে ম্যাট্রিকে ও সেকেণ্ড হয়েছিল—ফিজিকস্-এ অনারস্ নিয়ে বি. এস-সি. পাশ করে সামান্য স্কুল-মাস্টার হয়েছিলো—আজ ওর অবস্থা দেখুন একটা ব্রিলিয়ান্ট স্কলার—

গুরু : কেন এমন হলো ?

অমিয় : সব সময় ও ভাবছে ওর মা-বাবা-ভাই-বোনের মৃত্যুর জন্য ওই দায়ী।

গুরু : কেন ?

অমিয় : পাকিস্তানে দাঙ্গার সময় গুণ্ডারা যখন ওদের বাড়ী চড়াও করেছিল তখন সকলকে ফেলে ও একা পালিয়েছিলো। ও বেঁচেছে আর সবাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বলি হয়েছে—মর্মান্তিক কিন্তু কতোদিন আগেকার ঘটা সেই ঘটনার স্মৃতি নাকি আজও সব সময় ওকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে—একটুও শান্তি পাচ্ছে না ও বহুজায়গায় চাকরী করেছে কিন্তু কোথাও টিঁকতে পারে নি—সময় সময় ছুটে জঙ্গলে যেতে চায়—

গুরু : উনি বিবাহিত ?

অমিয় : হ্যাঁ গুরুদেব।

গুরু : ছেলেমেয়ে ?

অমিয় : একটি ছেলে একটি মেয়ে—

গুরু : তারা কোথায় ? [হঠাৎ দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ওঠে হিরণ্ময় সান্যাল।]

হিরণ্ময় : জাহান্নমে ! আমি—আমি এসেছি আপনার কাছে দীক্ষা নিতে—দীক্ষা দেবেন দেবেন, না দেবেন না দেবেন—আমার ছেলেমেয়ে কটা—আমি বিবাহিত কিনা—সবাই কোথায় থাকে কি করে অতো সব খবরের দরকার কি আপনার—আপনি কি ভেবেছেন আপনি ছাড়া দুনিয়ার আর গুরু নেই—হাজার হাজার আছে—রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে—এ বাজে লোক অমিয়—ভীষণ বাজে লোক। এখান থেকে পালিয়ে চলো—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

[শুভ্রা স্তব্ধ ; গুরুদেবের দৃষ্টি স্থির, অমিয় কিংকর্তব্য বিমূঢ়।]

অমিয় : হিরণ ! হিরণ ! কি বলছো তুমি। কাকে কি বলছো ! গুরুদেব !

হিরণ্ময় : গুরুদেব না হাতি ! দশ আঙুলে দশটা হীরের আংটি পরে, গলায় মুক্তোর মালা ঝুলিয়ে বাবরি চুল রেখে তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে বসে রূপোর

থালায় সন্দেশ খাচ্ছে—এই তোমার গুরু ? ফুঃ ! মরে গেলেও এর কাছে দীক্ষা নেবো না আমি—চলো—চলো—অন্য কারো কাছে চলো—চলে এসো বলছি ? [গুরুদেবকে অশান্ত বলে মনে হয় ।]

অমিয় : আঃ ! হিরণ, কি বলছো—কি বলছো তুমি !

গুরু : ওকে তুমি নিয়ে যাও অমিয়—ওর চিকিৎসার সব খরচা আমি দেবো—হ্যাঁ, আমি দেবো সব খরচা, ওকে তুমি সুস্থ করে তুলবার চেষ্টা করো-আমি সুস্থ হয়েও যার সঙ্গে আপোষ করেছি ও অসুস্থ হয়েও তার সঙ্গে আপোষ করতে পারছে না—ও আমার চোখ খুলে দিয়েছে—ও আমার গুরু—ওর শান্ত চোখের ঘোলাটে দৃষ্টির তীব্রতা আমি সহ্য করতে পারছি না—ওকে তুমি নিয়ে যাও—ও সুস্থ হলে এখানে আসবার দরকার নেই ওর—আমি ছাড়াই ও পথ চলতে পারবে । এসো—

অমিয় : হিরণ—এসো ।

হিরণ : অ্যাঁ !

অমিয় : এসো । [গুরুদেবকে দেখতে দেখতে অমিয়র সঙ্গে চলে যায় হিরণ্ময় ।]

গুরু : শুভ্রা, এগুলো বিক্রি করে-যা পাওয়া যাবে তাতে কি হিরণ্ময়ের চিকিৎসা হবে না ? [হীরের আংটি, মুক্তোর মালা খুলে শুভ্রার হাতে দিতে দিতে বলেন ।]

শুভ্রা : গুরুদেব !

গুরু : যদি আরো লাগে তাহলে তোমার ভাড়ার থেকে দিও—আমি পরাজিত—আমি নিরস্ত্র ।

[গুরুদেব ভেতরে চলে যান । শুভ্রার বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায় গুরুদেবের এই অস্বাভাবিক আচরণে । বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে শঙ্কর মিত্র । বেশ কিছুক্ষণ আগে মদ খেয়েছে শঙ্কর, নেশা তার এখনো পুরোপুরি যায়নি । তাকে দেখে জিনিসগুলো লুকোবার চেষ্টা করে শুভ্রা । শঙ্কর মিত্র হেসে বলে ।]

শঙ্কর : কি লুকোচ্ছো আমাকে দেখে ? এই দেখো, আর সাড়া শব্দ নেই যে ? আজ কি তোমার মৌনব্রত নাকি—অ্যাঁ। না, আজ তো শুক্রবার নয় ? দেখো, আমি চোর ডাকাত গুণ্ডা বদমাস নই আমাকে দেখে লুকোচ্ছোটা কি ? [জোর করেই দেখতে হয় শঙ্করকে। দেখে হেসে দূরে সরে গিয়ে শঙ্কর বলে—হীরের আংটি—মুক্তোর মালা। তা আমাকে দেখে ওগুলো লুকোবার কি আছে ? আমি কি কখনো ও সব চোখে দেখিনি নাকি। আমার বাড়ীর ঝি মুক্তোর মালা পরতো—আমার চাকরের হাতে হীরের আংটি ছিলো—আমি দিয়েছিলাম—জানো ?

শুভ্রা : জানি।

শঙ্কর : জানো তো লুকোচ্ছো কেন ওগুলো ? ভগবানের নাম নিচ্ছো—মন পবিত্র করছো—অথচ ভেতরে ভেতরে জিলিপীর প্যাচ ? একেই বলে মেয়ে মানুষ—মরে নরকে বা স্বর্গে যেখানেই যাক গিয়ে প্রথমেই স্যাঁকরার বাড়ী কতদূর তার খোঁজ নেবে। ছ্যাঁঃ ! ছ্যাঁঃ ! ছ্যাঁঃ ! গঙ্গা জলে হাত ধুয়ে ফেলো।

শুভ্রা : এখানে এসেছো কি করতে ?

শঙ্কর : মাঝে মাঝে তোমাকে দেখতে ইচ্ছে যায় না ? আমি মানুষ তো ?

শুভ্রা : সন্দেহ আছে।

শঙ্কর : এমন ভাবে তাকাচ্ছো মনে হচ্ছে ডাস্টবিনের দিকে তাকিয়ে আছো ?

শুভ্রা : ঠিকই ধরেছো ?

শঙ্কর : যাচ্ছি—যাচ্ছি—একবার তোমাকে দেখে গেলাম—অনেকদিন বাদে এলাম—গুরুদেব কোথায় ?

শুভ্রা : ব্যস্ত আছেন ?

শঙ্কর : গৌতম ?

শুভ্রা : পড়ছে।

শঙ্কর : একজনের সঙ্গেও তাহলে আজ দেখা হবে না ? দুজনেই ব্যস্ত ?

শুভ্রা : হ্যাঁ। [ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন গুরুদেব।]

শঙ্কর : বাইরের খোলশটাই ওর ছাড়িয়েছো গুরুদেব, ভেতরের খোলশটা ছাড়াতে পারলে না—কি রকম গুরু তুমি-অঁ্যা ? মায়া হয় পাগলাটার জন্য ভীষণ মায়া হয়—এখানেও কিছু পেলো না—ওপারে গিয়ে ও কিছু পাবে না —বেচারা! বিরক্ত হয় জেনেও আসি—না এসে থাকতে পারি না—এও আমার এক রোগ—দুরারোগ্য রোগ। বড্ড কষ্ট দেয়—চলি।

গুরুদেব : বোসো।

শঙ্কর : না থাই—ঘুম পেয়েছে—দাঁড়াতে পারছি না—তোমার শিষ্যা আবার আজ আমাকে চোর-ডাকাত ঠাওরেছে—দেখছো না, গয়নাগুলো আগলে ধরে কি রকম বসে আছে—আমি বেশিক্ষণ থাকলে হয়তো ওগুলো যাবার ভয়ে হার্টফেলই করবে—চলি। [শঙ্কর চলে গেলে ডুকরে কেঁদে ওঠে শুভ্রা।]

গুরু : শুভ্রা!

শুভ্রা : কেন আমি ওকে এখানে আসতে বারণ করি—কেন আমি ওকে তাড়াই—আমার জ্বালা—আমার যন্ত্রণা—কে বুঝবে গুরুদেব—কেউ না—কেউ না। [ফুঁপিয়ে কাঁদে। শান্ত দৃষ্টিতে গুরুদেব তাকিয়ে রয়েছেন তার দিকে। মঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে।]

॥ চার ॥

[মঞ্চের আলো জ্বললে দেখতে পাওয়া যায় পুলিশ অফিসার প্রবাল গুপ্তের পড়বার ঘর। ঘরে দুটো দরজা আর একটা জানলা। দরজা-জানলায় পর্দা লাল। ঘরে আসবাব পত্র বলতে একখানা সোফা-কাম্-বেড রয়েছে তার ওপরে পাতা রয়েছে একটা ঘি-রঙা চাদর ও বালিশ। একটা ছোট

টেবিল একটা চেয়ার একটা ইজিচেয়ার। টেবিলের ওপর রয়েছে বেশ কয়েকখানা বই, জার্নাল, একটা অ্যাস্‌ট্রে ও একটা টেবল্‌ ল্যাম্প। দুটো বই-এর আলমারী বই-এ ভর্তি। দেওয়ালে একখানা ক্যালেণ্ডার এবং প্রবাল-শ্রাবণীর সঙ্গে তোলা একখানা ফটো টাঙানো রয়েছে। ইজি-চেয়ারে বসে একখানা অপরাধ বিজ্ঞানের বই পড়ছেন প্রবাল গুপ্ত। ভেতরের ঘর থেকে বাইরে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে শ্রাবণী এসে ঢুকেছে এ ঘরে। তাকে দেখেই বই বন্ধ করেছে প্রবাল। সিগারেট ও লাইটার হাতে নিয়েছে।]

শ্রাবণী : তুমি খেয়ে নিও—আমার ফিরতে অনেক রাত হবে।

[বিরক্তি ও ঝাঁঝ মেশানো গলায় প্রবাল বলে সিগারেট ধরিয়ে।]

প্রবাল : দাঁড়াও।

শ্রাবণী : বলো ?

প্রবাল : কোথায় যাচ্ছো ?

শ্রাবণী : আশ্রমে।

প্রবাল : তোমার গুরুদেবের কাছে ?

শ্রাবণী : হ্যাঁ।

প্রবাল : না।

শ্রাবণী : কি না ?

প্রবাল : যাবে না।

শ্রাবণী : কোথায় ? [ইজিচেয়ার ছেড়ে—উঠে দাঁড়িয়ে প্রবাল গুপ্ত বলে—

প্রবাল : আশ্রমে—গুরুদেবের কাছে।

শ্রাবণী : কেন ?

প্রবাল : আমি তোমার স্বামী—আমার আদেশ, তুমি যাবে না।

শ্রাবণী : তোমার আদেশ আমি মানতে পারবো না।

প্রবাল : হুঁ।

শ্রাবণী : একস্‌কিউজ মি।

প্রবাল : স্থ—স্থ—আমার অনুরোধ—আমার অনুরোধ—আদেশ নয়, আদেশ আমি উইথড্র করছি স্থ—তুমি যেওনা প্লিজ—ও কাপড় পরলে তোমার দিকে আমি তাকাতে পারি না স্থ—প্লিজ।

শ্রাবণী : এমন অবান্তর অনুরোধ কেন করছো তুমি?

প্রবাল : অবান্তর!

শ্রাবণী : নিশ্চয়ই।

প্রবাল : কেন যাবে তুমি—কেন? বাইরে থেকে লোক ঠেঙিয়ে এসে এতো বড়ো বাড়ীতে একা পড়ে থাকবো না বলেই, শুধু সব সময়ের সঙ্গী করে তোমাকে আমি আনিনি!

শ্রাবণী : কেন এনেছিলে তবে?

প্রবাল : আমার পার্টনার হবে তুমি—সব কাজে আমাকে উৎসাহ দেবে, প্রেরণা দেবে—আমাকে অ্যাসিস্ট করবে—আমাকে ফিল্ করবে।

শ্রাবণী : তোমার সব কাজের সব সময়ের সঙ্গী কি আমি হই নি?

প্রবাল : হয়েছিলে—আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু যবে থেকে আনন্দ গোস্বামীর খোঁজ পেয়েছো, লতার মতো তাকে জড়িয়ে ধরে উঁচুতে উঠবার স্বপ্ন দেখছো তুমি। আর আমি একটু একটু করে অনেক দূরে সরে গেছি—তুমিই আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছো।

শ্রাবণী : এ তোমার ভুল ধারণা।

প্রবাল : ভুল নয়—ভুল নয় স্থ—সত্যির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—প্রতি মুহূর্তে ফিল করছি আমি—আমার কতো কাছের অথচ কতো দূরের তুমি—বিরাট একটা পাঁচিল উঠে দাঁড়িয়েছে আজ তোমার আমার মধ্যে।

শ্রাবণী : তোমার কল্পনা তোমাকে মিছে কষ্ট দিচ্ছে—আমার কিছুই বলবার নেই।

প্রবাল : আছে। অনেক কিছুই বলবার আছে তোমার—অনেক কিছু করবার আছে—বলতে হবে—করতে হবে।

শ্রাবণী : কি করতে হবে শুনি ?

প্রবাল : আনন্দ গোস্বামীকে ছাড়তে হবে—হ্যাঁ, ছাড়তেই হবে।

শ্রাবণী : কি বলছো তুমি !

প্রবাল : মাই অর্ডার। [ঘরে একটা অবাঞ্ছিত নীরবতা। দৃঢ় কিন্তু শান্ত কণ্ঠে শ্রাবণী বলে।]

শ্রাবণী : যদি না ছাড়ি ?

প্রবাল : আমাকে ছাড়তে হবে। [শ্রাবণীর বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।]

শ্রাবণী : প্রবাল !

প্রবাল : দেয়ার ইজ নো অলটারনেটিভ্।

শ্রাবণী : প্রবাল !

প্রবাল : দিদি ! আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো সর্বনাশ ডেকে এনেছে—আমার নিজের দিদি—সে যদি আজ থাকতো—[আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রবল ইচ্ছে শ্রাবণীকে পেয়ে বসেছে।]

শ্রাবণী : আমাকে গুরুদেবের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে ? ড্রয়ার থেকে রিভলভার বের করে তাঁর বুকে গুলি মারতে—কি করতে শুনি ? সব পারো তুমি।

প্রবাল : হ্যাঁ সব পারি আমি—তাই করতাম। আনন্দ গোস্বামী—আনন্দ গোস্বামী—আমার জীবনের ধূমকেতু—আমার দুঃস্বপ্ন—আমার নিজে হাতে গড়া সুখের সংসারে সে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দূরে বসে মজা দেখছে—আই মাস্ট্ নট্ টলারেট্ দিস—আই উইল নেভার একস্‌কিউজ হিম্-আমি—হ্যাঁ, আমি তাকে ঘৃণা করি আমি তাকে অস্বীকার করি—আমি—আমি তাকে ভুলতে চাই। [অশান্ত হয়ে উঠেছে প্রবাল গুপ্ত।]

শ্রাবণী : প্রবাল !

প্রবাল : তোমাকেও ভুলতে হবে তাকে—তাকে ছাড়তে হবে।

শ্রাবণী : ছিঃ-ছিঃ প্রবাল, তোমার আচরণ একটা বাচ্চা ছেলেকেও হার মানিয়েছে।

প্রবাল : সত্যি কথা আমাকে বলতেই হবে তোমার কানে তা যতো খারাপই লাগুক।

শ্রাবণী : বিকৃত সত্যি, কনকক্টেড্ ফ্যাকট্ নিয়েই তো তোমার কারবার, তার ওপরে উঠবে কি করে তুমি—সে চিন্তাশক্তি কোথায় তোমার? কতোটুকু সত্যির খবর তুমি রাখো? গুরুদেবকে একবার দেখলে তাঁর সংস্পর্শে এলে যা তুমি ভাবছো যা কল্পনা করে মনে মনে শিউরে উঠছো—যা বলছো—আর কখনো তা রিপিট্ করতে পারতে না।

প্রবাল : দেখবার দরকার আমার নেই। যতো বড়ো মহাপুরুষই হোন না কেন তোমার আনন্দ গোস্বামী, মরে গেলেও তার কাছে আমি যাবো না—ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না আমি, ঈশ্বরের রিপ্রেজেনটেটিভকে বিশ্বাস করবো—নেভার। ফ্র্যাঙ্ক অ্যাণ্ড ফাইনাল—তুমি তার কাছে যাবে না।

শ্রাবণী : এ তোমার অন্যায় আব্দার।

প্রবাল : বেশ তাই। তোমাকে আমি যেতে দেবো না।

শ্রাবণী : কি করবে?

প্রবাল : আটকাবো।

শ্রাবণী : আটকাবে তো শরীরটা, মনটাকে আটকাবে কি করে? কি দিয়ে?

প্রবাল : আই হ্যাভ্ দ্যাট্ পাওয়ার—আই হ্যাভ্ দ্যাট্ ক্যালিবর। আমি সত্যিই বুঝতে পারি স্থ—কিসের অভাব তোমার কিসের জন্য কিসের নেশায় একটা আশ্রমের দোরে একটা লোকের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরছো।

[শ্রাবণী নিরুত্তর।]

কেন তুমি বাপিকে বাড়ীতে না রেখে হোস্টেলে রেখেছো, কেন—তুমি আমাকে অবজ্ঞা করে, অস্বীকার করে, তার ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছো—

আমি বুঝতে পারি না ভেবেছো? আই অ্যাম্ নট ফুল? গাড়োল নই আমি? মানি, স্তোসাল স্ট্যাটাস্ সব কিছু রয়েছে তোমার—তবু—

[শ্রাবণীর নিস্তব্ধতায় ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে প্রবাল।]

কি সুখ, কতোটা সুখ তুমি পাও সেখানে গিয়ে—চুপ করে আছো কেন: জবাব দাও?

শ্রাবণী : জবাব দেবো ভাষা কোথায়? তুমি তো আমায় স্তব্ধ করে দিয়েছো :

প্রবাল : যাবেই তুমি সেখানে?

শ্রাবণী : না গিয়ে আমি থাকতে পারবো না। অন্যায় কিছু আমি করিনি—কড়া নজর রেখে লোক অ্যাপয়েণ্ট করে গুরুদেবের সব খবরই তো তুমি নিয়েছো—পেয়েছো কোন ব্ল্যাক স্পট্? পেলে হয়তো এ্যাদ্দিনে তাঁকে আসামীর কাটগড়ায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতেও তোমার আটকাতো না?

প্রবাল : মিথ্যে কথা?

শ্রাবণী : তোমার প্রোটেস্ট করবার ভঙ্গীই বলে দিচ্ছে সত্যি না মিথ্যে। তুমি এতো নিচুতে নেমেছ একজন মহাপুরুষের সঙ্গে আমার ইম্‌মরাল কানেকশান আছে কিনা তার খোঁজ খবরও নিয়েছো—আমায় অবিশ্বাস করেছো—তাঁকে অপমান করেছো।

প্রবাল : প্লিজ্ ডোনট্ মেক মি ম্যাড্।

শ্রাবণী : আমার দরকার হবে না—তুমি নিজেই নিজেকে পাগল করে তুলতে পারবে। আমি অশিক্ষিতা ছিলাম···অনেক মেয়ের ভীড় থেকে দয়া করে আমায় তুমি বেছে নিয়েছিলে···আমার গরীব বাবার কাছ থেকে একটা পয়সাও না নিয়ে আমায় বিয়ে করে এনে তুলেছিলে তোমাদের এই অভিজাত পরিবারে—আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমায় শিক্ষিতা করে আলোর রাস্তায় হাঁটতে শিখিয়েছো তুমি, তোমার ঋণ আমি জীবনে ভুলবো না। তাই বলে—

[অনেক কঠিন অনেক কড়া কথা রাগের মাথায় বলে ফেলেছে প্রবাল।

সে বরাবরই অসহিষ্ণু তবু সে বুঝতে পারে আজ সে বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে। শ্রাবণীর এমনি ধারা কথায় সে বিব্রত হয়ে পড়ে। কিছুটা আপশোস্ কিছুটা অনুশোচনা তাকে পীড়া দেয়। সে শান্ত হয়েছে।]

প্রবাল : নু! দেখো—তোমার আমার সম্পর্ক আজ কর্তব্য আর ঋণের গণ্ডীর মধ্যে এসে দানা বেঁধেছে। বলো, তুমিই বলো—এ সম্পর্কের মূল্য কতটুকু? স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা—

শ্রাবণী : আমি তর্ক করতে চাই না প্রবাল—তোমার সঙ্গে তর্ক করবার ক্ষমতাও আমার নেই—আমায় তুমি আমার নিজের রাস্তাতেই চলতে দাও—এ আমার ভিক্ষে তোমার কাছে।

প্রবাল : তার মানে তোমার গুরুদেবকে তুমি ছাড়তে পারবে না?

শ্রাবণী : না।

[মুহূর্তে আবার অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে প্রবাল]

প্রবাল : তবে আমার সঙ্গে তোমার এই লোক-দেখানো জোড়াতালি দেওয়া সামাজিক সম্পর্কটাই বা রেখে লাভ কি? আদালতে গিয়ে চুকিয়ে দাও এটা—স্বাধীনভাবে নিজের রাস্তায় চলতে পারবে, কেউ বাধা হয়ে সামনে দাঁড়াবে না—আমি জানবো—আমার স্ত্রী—আমার স্ত্রী আমাকে পরিত্যাগ করে একটা গুরুর সঙ্গে—

[প্রবালের কথার চাবুক একেবারেই বোবা করে দিয়েছে শ্রাবণীকে।]

শ্রাবণী : প্রবাল। তুমি। তুমি।

[ছুটে এসে তার দু কাঁধ ধরেছে প্রবাল দু হাতে। সে বুঝতে পেরেছে সে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে একটা আত্মতিরস্কার তাকে অতিমাত্রায় অনুতপ্ত করে তোলে।]

প্রবাল : নু—নু—আমাকে—আমাকে তুমি ক্ষমা করো—আমাকে ক্ষমা করে দাও—নু—ইউ নো আই হ্যাভ নো কনট্রোল ওভার মাই টাঙ—ইউ নো আই হ্যাভ নো কনট্রোল ওভার মাইসেলফ। তোমার যা ইচ্ছে যা

খুশি তুমি তাই করো—আমি বাধা দেবো না—আই প্রমিস্—এবাড়ীঘর-দোর-সংসার আমি—সবকিছুই তো তোমায়—এসব ছেড়ে তুমি যেও না—তোমাকে, শুধু তোমাকে সুখী করতে পাগলের মতো এসব করেছি আমি আমাকে একটু ক্ষমা করো।

শ্রাবণী—আমি তো এসব কিছুই চাইনি তোমার কাছে—আমি দরিদ্র স্কুল-মাস্টারের মেয়ে—এ আমার কাছে অতিরিক্ত—কেন দিয়েছো এসব তুমি আমায়? বোকা ছিলাম—

[ঝর ঝর করে—কেঁদে ফেলে শ্রাবণী।]

কেন আমায় তুমি শিক্ষিতা করেছো? চোর ডাকাত জালিয়াত জোচ্চোর সমাজের যতো সব অপরাধী ঘাঁটতে ঘাঁটতে আজ নিজের স্ত্রীর সব কাজে অপরাধের গন্ধ পাও তুমি—সব কাজে আজ তুমি তাকে অবিশ্বাস করো।

প্রবাল—স্থ!

[ধীরে ধীরে সংযত হয় শ্রাবণী।]

স্থ!

[নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে প্রবাল। তার সেই শান্ত অসহায় চাহনি বিব্রত করে তোলে শ্রাবণীকে। এ যেন আর এক প্রবাল—যার মন খেয়ালী শিশুর মত যার মন প্রেমিকের। শ্রাবণী একটু এগিয়ে আসে।]

অনেক—অনেক ভুল করেছি আমি জীবনে—একটার পর একটা ভুল করেছি সবচেয়ে বড়ো—সবচেয়ে মারাত্মক ভুল আমি কি করেছি জানো স্থ? তুমি পাথর—তোমাকে ভালোবেসেছি।

[প্রবালের কথা শেষ হবার আগেই তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে মুখ লুকিয়েছে শ্রাবণী। প্রবালকে সে ভালোবাসে, গভীরভাবেই ভালোবাসে, তার তিরস্কার তাকে পরাজিত করতে পারেনি, তাকে পরাজিত করেছে অসহায় প্রবালের—প্রেমিক প্রবালের—চোখের কোণের

এক ফোঁটা জল। শ্রাবণী জানে প্রবাল তাকে কতো ভালোবাসে, দুজনেই যে একেবারেই ছেলেমানুষ। দুজনের কালচারাল কনফ্লিকট্ শুরু হলে দুজনেই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়—এখানে ওদের আজ জোড়াতালি। মঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে।]

॥ পাঁচ ॥

[একটু একটু করে আলোকিত হলো আশ্রমে গৌতমের ঘর। সন্ধ্যে উতরে গেছে অনেকক্ষণ। ঘরে তিনটে দরজা, একটা জানালা। ডানদিকের দরজা দিয়ে যেতে হয় গুরুদেবের স্টাডিরুমে, বাঁদিকের দরজা দিয়ে যেতে হয় শুভ্রার ঘরে, আর মাঝখানের দরজা দিয়ে ঢুকতে হয় এখানায়। দরজার ওপাশে টানা বারান্দা। দরজার ডানদিকে প্রায় দরজা ঘেঁষেই জানালাটা। একখানা ছোট খাট রয়েছে ঘরে, তাতে সাদা চাদর পাতা আর একটা বালিশ। খুব ছোট্ট একটা টেবিল রয়েছে ঘরে তার ওপর একগ্লাস জল ঢাকা। এবাড়ীর সব দরজা-জানালাতেই সোনালী পর্দা, এঘরেও তাই। গুরুদেবের একখানা ফটো রয়েছে ঘরের দেওয়ালে। খাটে বসে একখানা বই পড়ছে গৌতম একাগ্রমনে আর একখানা রয়েছে তার পাশে। গৌতমের ঘরে গৌতম আর রশ্মির ঘরে রশ্মি ছাড়া কেউ নেই আজ আশ্রমে। মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী গেছেন—গুরুদেব সঙ্গে গেছে শুভ্রা। রশ্মি এসে দাঁড়িয়েছে মাঝখানের দরজার পর্দা তুলে। ঠোঁটের কোণে তার

মিষ্টি হাসি, চোখে দুষ্টুমির রেখা। নাচের পোশাক পরেছে রশ্মি, পায়ে তার ঘুঙুর। ঘুঙুরের শব্দ করে গৌতমকে সে তার উপস্থিতি জানাতে চায়। গৌতম শুনতে পায় না। আরো জোরে ঘুঙুর বাজায় রশ্মি—এর পরে আরো জোরে এবং দ্রুততালে। আস্তে চোখ তুলে তাকায় গৌতম, সঙ্গে সঙ্গে দুহাত জোড় করে তাকে নমস্কার করে রশ্মি। বেশ একটু অবজ্ঞা—বেশ একটু বিদ্রূপ মেশানো তার নমস্কারের ভঙ্গিমায়]

গৌতম : রশ্মি !

রশ্মি : হ্যাগো—ধ্যান ভেঙেছে মুনির ?

গৌতম : আমি পড়ছি।

রশ্মি : তার মানে ধ্যানস্থ ?

[ঘরের ভেতরে অনেকটা ঢুকে এসেছে রশ্মি তার সর্বশরীরে ঢেউ যেন দোল খাচ্ছে।]

আমি যে ধ্যান ভাঙাতে এসেছি। বই এ পড়েছি, মুনি ঋষিরা ধ্যান করতো—অপ্সরারা এসে তাদের সামনে নেচে গেয়ে ধ্যান ভাঙাতো—পড়োনি তুমি ?

[আরো এগিয়ে এলো রশ্মি।]

সবাই চলে গেলো—একা একা বাগানে বসেছিলাম হঠাৎ মনে পড়লো তুমি তো রয়েছো, যাই তোমার কাছে—পা টিপে টিপে জানলায় চলে এলাম—দেখি, মোটা জাবদা বই নিয়ে তুমি হিমসিম খাচ্ছো—ঘরে গিয়ে নাচের পোশাকটা পরে এলাম—কেমন মানিয়েছে দেখে একটু বলো না।

গৌতম : পড়তে দেবে না ?

রশ্মি : পড়ো না—কে বারণ করেছে তোমায় ? যতো খুশি পড়ো। না পড়লে মগজে বিদ্যে গজগজ করবে কি করে—লোককে পায়ের তলায় বসিয়ে জ্ঞান দেবে কি করে ? গুরুদেব স্বর্গে গেলে বড়ঘরের বেদীতে বসবে কি করে ? পড়তে হবে বৈকি—অনেক—অনেক পড়তে হবে—পড়ে পড়ে সব

বই শেষ করে ফেলতে হবে। লক্ষ্মীছেলে, পড়ো—মুখটি নিচু করে যতো খুশি ঘাস খাও।

গৌতম : তুমি যাও এখান থেকে।

রশ্মি : তাড়িয়ে দিচ্ছো? তোমায় নাচ দেখাবো বলে এতো করে পরে এলাম এগুলো—আমায় দেখেই তুমি তাড়াতে চাইছো,—উচিত হচ্ছে এটা?

গৌতম : আমি একটু ব্যস্ত আছি।

রশ্মি : আমি যেন সবসময় বসে আছি? দু'দশ মিনিট আমার নাচ দেখবার সময় নেই তোমার?

গৌতম : সত্যি নেই।

রশ্মি : পুরোপুরি ওটার মধ্যে ঢুকে গেছো?

[বইটা দেখিয়ে বিদ্রূপমিশ্রিত গলায় বলে রশ্মি।]

সবসময়ই তো দেখছি একটা নয় একটা কিছু পড়ছো—আচ্ছা, কি এতো পড়া বলতো? এত পড়তে ভালো লাগে তোমার? আমার তো মোটা বই দেখলেই ইনফ্লুয়েঞ্জা আসে। বন্ধ করো না ওটা—বাব্‌বাঃ! কি মোটা বই! কতোপাতার বই?

গৌতম : যেতে বললাম শুনতে পাও নি?

রশ্মি : পেয়েছি—আমি কালা নই।

গৌতম : তাহলে যাচ্ছো না কেন?

রশ্মি : আমাকে যে একেবারেই সহ্য করতে পারছো না? আমি কালো বলে? তোমার মতো তিনটে এম. এ. পাশ করে বিদ্যের রকেট হতে পারিনি বলে?

গৌতম : এই সব বলতে বুঝি আমার ঘরে এসে ঢুকছো?

রশ্মি : ওঃ তাই তো, এটা তো তোমার ঘর—এঘরে এসে ঢুকলেই দর্শনের বুলি আওড়াতে হয়—সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতে হয়—মহাপুরুষদের বাণী নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে হয়—জ্ঞানের ধোঁয়ায় ভর্তি এ

ঘর—ইস্‌-ইস্‌-ইস, একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।

গৌতম : কি বলতে চাও গুছিয়ে বলো তো?

[হাত দুটো পেছনে নিয়ে একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে কথা বলে রশ্মি]

রশ্মি : বলতে তো চাই অ-নে-ক কিছু—শুনবে কে বলো?

গৌতম : কাজের কথা হলে নিশ্চয়ই শুনবো।

রশ্মি : তুমি শুনবে। তাহলেই হয়েছে—তোমায় বলতে যাবোই বা কেন আমি? সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, স্বপ্নকল্পনার গোপন কথা, কাজের অকাজের কথা মানুষ বলে মানুষকে—তুমি তো আর মানুষ নও—মেশিন।

গৌতম : মেশিন!

রশ্মি : হ্যাঁ গো মেশিন—দস্তুরমতো মেশিন—বিরাট বড়ো একটা মেশিন—তোমার না আছে চোখ, না আছে কান, না আছে মন, না আছে অনুভূতি—সব কলকব্জাগুলো তালগোল পাকিয়ে ঢুকে আছে ঐ ফাঁপা বলটার মধ্যে।

[গৌতমের মাথাটাকে ইঙ্গিতে ফাঁপা বল বলে রশ্মি।]

সুইচ জ্বালালে মেশিন চলে—সুইচ নেভালে মেশিন বন্ধ।

[অত্যন্ত বিরক্ত হয় গৌতম। রশ্মির কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। সে কথা বলে চলে তার নিজের খেয়ালে।]

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি—পাদুটো ধরে গেছে—তুমি তো আর বসতে বলবে না—নিজেই বসি একটু, কি বলো?

[ঢক্‌ঢক্‌ করে টেবিলের ওপরকার জলের গ্লাসের জল খেয়ে নেয় রশ্মি। গ্লাসটা খাটের পাশে রেখে টেবিলটার ওপরেই বসে পড়ে রশ্মি। টেবিলটাকে খাটের কাছে টেনে নিয়ে একেবারে মুখোমুখি হয়ে গৌতমের।]

তোমায় বড্ডো বিরক্ত করছি, না? ভেতরে ভেতরে আমার ওপর খুউব ক্ষেপাচো, না? চোখমুখ একেবারে লাল হয়ে উঠেছে—আমি কালো হয়ে ভালোই আছি—রাগে নাক কান লাল হলেও ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে রাখলে

কেউ টেরই পাবে না, না? কি ফরসা তুমি। গুরুদেবের চেয়েও ফরসা—তোমার নাক-কান চিবুক কিন্তু একেবারে গুরুদেবের মতো—তাই তো এতো জ্ঞান—না বাবা, বাজে কথা বলে আর তোমায় ডিসটার্ব করবো না—দুটো ভালো কথা বলি—কি পড়ছো ওটা—কি পড়ছো—বলোই না?

গৌতম : হিন্দুইজম্।

রশ্মি : হিন্দুধর্ম!

গৌতম : হ্যাঁ।

রশ্মি : এখনো আছে? আমি তো ওর ভেতরের ব্যাপার কিছুই বুঝি না—মনে হয়, বড্ডো সেকেলে—বড্ডো পুরোনো—বড্ডো একঘেয়ে—বড্ডো গোঁজামিল ওতে, না?

গৌতম : কি বকছো পাগলের মতো? হিন্দুধর্মের তুমি কি বুঝবে? হিন্দুধর্ম—

রশ্মি : বি—রা—ট ধর্ম, বি—রা—ট ব্যাপার—ওটা বন্ধ করে দুচারটে মানব ধর্মের কথা বলোতো শুনি।

[নিজেকে সংযত করে নিয়েছে গৌতম। সে জানে রশ্মির সঙ্গে তর্ক করার চেয়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয়।]

আজকের দিনটা বেশ, না? গুরুদেব বাড়ীতে নেই—মা বাড়িতে নেই—অনেকক্ষণ ধরে তোমায় জ্বালানো যাবে, কি বলো? অবিশ্যি তুমি যদি মেরে তাড়াও তাহলে প্রাণ নিয়ে পালাতেই হবে—প্রাণের মায়া বড্ডো মায়া—তা কি তুমি পারবে—তুমি যে আবার খাটি হিন্দু—ঠেঙাতে পারবে না—তার ওপর আমি আবার অবলা নারী—আচ্ছা, ছোঁয়াছুয়ি হলে স্বর্গের সিংহাসন থেকে একেবারে নরকের ফুটন্ত কড়ায় গিয়ে পড়বার ভয় নেই তো তোমার? আছে, না?

[তার কথার উত্তর না দিয়ে গৌতম আবার বই-এ মন দেয়।]

কি যাচ্ছেতাই রং! জানলা-দরজার পর্দাগুলো পালটে দিতে ইচ্ছে যায় না

তোমার ? আমার কি ইচ্ছে করে জানো ? সব ঘরের দরজা-জানলায় সবুজ পর্দা টাঙিয়ে দি—তুমি কি বলো? সবুজ রং তোমার ভালো লাগে না?

[গৌতম রশ্মিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। সামান্য গম্ভীর হয় রশ্মি]

আমি ভীষণ বোকা-না ? কি করি বল ? মাথার ভেতরটা আমার একদম ফাঁপা—আমার দোষ ? গুরুদেব এতো খরচা করলেন—তোমার পণ্ডশ্রম হলো —তিন তিন বারেও আই-এ পাস করতে পারলাম না— বুড়ো ধাড়ী মেয়ে আমি –পাস করা উচিত ছিলো, ছিলো কি না ? গুরুদেব আমার ওপর ভীষণ চটেছেন, মুখে তো কিছু বলবেন না ভেতরে ভেতরে চটবেন—এতে আমার আরো বেশী করে লাগে—দোষ করেছি, গালাগাল দিন—না দিলে কষ্ট হয় না ? তুমিও চটেছো খু-উ-ব আমার ওপর—তুমিও তো গুরুদেবের চেলা, তুমিও কিছু বলবে না—আমি সব বুঝতে পারি—সত্যি কথা বলবে, তোমার কাছে পড়তে আমার ইচ্ছেই করতো না—তুমি নিজে নিশ্চয়ই বুঝতে পারো, তা নাহলে তিন তিনটে সাবজেক্টে এম-এ পাস করলে কি করে ? তোমার মুখ দেখে তো আর সার্টিফিকেট দেয়নি ? তুমি কিন্তু একদম বোঝাতে পারো না—বোঝাতে পারলে আমি কি পাস করতাম – আই-এ পাস করা কি এমন কথা ? আমার চেয়ে আরো বেশী বোকা মেয়েরাও তো পাশ করছে—করছে না ?

গৌতম : কথা শেষ হয়েছে ?

রশ্মি : বলি না বাবা দু'চারটে কথা—শেষ তো যখন ইচ্ছে করে দিলেই হলো—কথা তো আমি তোমার সঙ্গে বলছি না—তুমি তো পড়ছো ? হাওয়ার সঙ্গে, আলোর সঙ্গে, দেওয়ালের সঙ্গে, খাটের সঙ্গে কথা বলছি আমি, তুমি ফোঁস করে উঠছো কেন ? বুঝতে পারছো না বুঝি—অতো গোঁজামিল বুঝবে কি করে ?

গৌতম : আর কিছু বলবে ?

রশ্মি : হ্যাঁ বলবো, কথা না বললে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

গৌতম : বলো যতো খুশি।

রশ্মি : এতো রাগের কথা—একদম কথা না বলে কি করে থাকো তুমি, মাথা গরম হয়ে যায় না ?

[গৌতম একেবারেই নিরুত্তর।]

আমার সবগুলো গাছে ডাঁটি বেরিয়েছে জানো! রোজ দুবেলা জল দি যে আমি—কতো সার দিয়েছি—তোমার গোলাপ গাছের একটাতেও ফুল ফোটেনি এখনো—একদম জলই দাও না নাকি ? আমি দিতে পারি—তুমি যদি বলো, কাল সকাল থেকেই দেবো—দেবো ?

গৌতম : আঃ! রশ্মি।

রশ্মি : কি হলো ?

গৌতম : অসহ্য—অসহ্য লাগছে !

রশ্মি : কি ? আমাকে ?

গৌতম : হ্যাঁ—বড়ো জ্বালাচ্ছো তুমি !

রশ্মি : আমি তো ক্যাটকেঁটেই—সত্যি, তোমার জন্য মায়া হয়—বর্তমান ভবিষ্যৎ দুইই অন্ধকার তোমার।

[চূড়ান্ত বিরক্তিতেও হেসে ফেলে গৌতম।]

হাসলে যে ? বিশ্বাস হলো না বুঝি ?

গৌতম : বোকার মতো কথা বলো না—যাও এখান থেকে।

রশ্মি : নতুন কথা কি বললে ? আমিতো বোকাই, সবাই জানে, আমিও জানি। বলতে চাও তো নতুন কিছু বলো—যা কখনো শুনিনি ?

গৌতম : কি আবোল-তাবোল বকে সময় নষ্ট করছো!

রশ্মি : আবোল-তাবোল বকাতে পেয়েছে যে আমায়—ওষুধ থাকতে দাও একডোজ খাই—সেবার এসে বললাম মনটা ফাঁকা ফাকা লাগছে, একটা ভালো বই দাও—এমন একটা বিদ্‌ঘুটে বই দিলে, পড়ে মনটা আরো ফাকা হয়ে গেলো—বাজে ডাক্তার তুমি।

গৌতম : বসে বসে এই করবে তুমি।

রশ্মি : দাঁড়িয়ে নাচবো একটু দেখবে ?

গৌতম : না।

রশ্মি : দশ মিনিট ?

গৌতম : না।

রশ্মি : সাত মিনিট।

গৌতম : না বলছি।

রশ্মি : পাঁচ মিনিট ?

[গৌতম তার দিকে তাকালে চূড়ান্ত অনুনয়ের স্বরে রশ্মি কথা বলে গৌতমের দিকে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে।]

তিন মিনিট ? দুমিনিট। এক মিনিট ?

গৌতম : তারপর যাবে তো এখান থেকে ?

রশ্মি : যাবো—ঠিক যাবো।

গৌতম : বেশ নাচো।

[গৌতমের সম্মতি পেয়ে খুশীর গাঙে বান ডাকে রশ্মির। মুহূর্তে সে নাচ শুরু করে। সে মরীয়া, গৌতমকে সে মুগ্ধ করবেই করবে। এক মিনিট দুমিনিট করে পাঁচ মিনিট কোথা দিয়ে চলে যায়—গৌতম রশ্মি কারোই খেয়াল থাকে না। চঞ্চল উচ্ছল ঝরনার মতো নেচে চলেছে মিষ্টি মেয়ে রশ্মি—অপূর্ব তার নাচ। মুগ্ধ বিস্মিত রোমাঞ্চিত হয়েছে গৌতম। কখন যে সে বই বন্ধ করে দু'পা ঝুলিয়ে খাটে বসেছে সে খেয়াল নেই তার। নাচে ইতি টানবার আগে গৌতমের ঘনিষ্ঠ হয় রশ্মি। তারপর একসময় তার একেবারে কাছে এসে হঠাৎ বসে পড়ে গৌতমের পা দুটো তার নিজের বুকের মধ্যে নিয়ে চোখ বোজে রশ্মি—আনন্দে আবেগে। বিদ্যুতের শক্ খেয়ে যেন লাফিয়ে উঠেছে গৌতম। উঁচু সংযত গলায় সে বলে ওঠে।]

গৌতম : রশ্মি! রশ্মি! চলে যাও—চলে যাও তুমি এখান থেকে!

রশ্মি : যাবো না—যাবো না—কিছুতেই যাবো না আমি—এ ঘর আমার—এ ঘর ছেড়ে আমি কোথ্‌থাও যাবো না।

[রশ্মির চোখে জল। অতিমাত্রায় বিস্মিত গৌতম। মঞ্চ অন্ধকার হয়।]

॥ ছয় ॥

[মঞ্চের আলো জললো। গুরুদেবের ঘর। গুরুদেব বেদীতে বসে আছেন। শুভ্রা-শ্রাবণীও ঘরে রয়েছে। তাঁর পায়ের তলায় বানোয়ারীলাল আগরওয়ালা। তার মাথায় হাত রেখেছেন গুরুদেব। প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে কিছুটা সরে গিয়ে বসে বানোয়ারী। পাঁচটা বড়ো বড়ো মিষ্টির প্যাকেট এনেছে বানোয়ারী। সেগুলো দেখিয়ে হেসে কথা বলেন গুরুদেব]

গুরু : এতো মিষ্টি—কে খাবে এতো?

বানোয়ারী : আপনি খাবেন—দিদি খাবেন—সোবাই খাবেন—পঁচাশ টাকার মিঠাই উতো আমি একাই শেষ কোরে দিতে পারি। সাত লেড়কীর পোরে লেড়কা হোলে মানুষ খুশী হোয় কিনা আপনি বোলেন?

গুরু : হয়—নিশ্চয়ই হয়।

বানোয়ারী : হাঁ গুরুদেব আমি খুশী হোয়েছি—খুউব খুশী হোয়েছি—আপনি—

গুরু : আমাকেও খুশী করতে চাইছো? আমি শুনেই খুশী হয়েছি—এতো মিষ্টির দরকার ছিলো না।

বানোয়ারী : সে তো আমি জানি গুরুদেব—আমার যে সোবাইকে পেটভর্তি

করে খানা খাওয়াতে ইচ্ছে যাচ্ছে—সোবাইকে নাওতা দেবো একদিন।

গুরু : ভালো তো।

বানোয়ারী : আপনাকেও আমার বাড়ীতে যেতে হবে—আমার লেড়কাকে আশীর্বাদ কোরতে হোবে—আপনি আশীর্বাদ কোরলো লেড়কা আমার রাজা হোবে।

গুরু : বলোকি আগওরওয়াল আমার ওপর এতো আস্থা, এতো বিশ্বাস তোমার ?

বানোয়ারী : বিশোয়াস্! আপনি বোলেন কি গুরুদেব ? আজ আমার যা কুছু হলো—সবকিছু তো আপনার দোয়াতেই হলো—সিরেফ ভিখিরী আমি রাজস্থান থিকে বংগাল এলাম—যা কুছু হলো, যা কুছু কোরলাম সোবকুছু আপনার দোয়া, আপনার আশীর্বাদ—আমার সোবকুছু তো অপনারই গুরুদেব!

গুরু : না আগরওাল, সব তোমার কোশিশ—তোমার পরিশ্রম, তোমার অধ্যবসায় ; তোমার ধৈর্য, তোমার সংযম, তোমার সাধুতা আজ তোমাকে এতো সব দিয়েছে—আমার কোন হাত নেই—সবাই তো পায় না!

বানোয়ারী : সোবাই যে আপনার কাছে আসে না—যে আসবে সেই পাবে।

গুরু : না আগরওয়াল, না, আমাকে ভালোবাসো আনন্দই পাবো—আমাকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ো না, আমি ভয় পাই, কেঁপে উঠি।

বানোয়ারী : উ সব আমি কুছু জানিনা—আমি শুধু আপনাকে জানি, আউর জানি ইয়ে সোব আপনার দোয়া—আমি বুঢ্—ভানুমতী বোলে—

গুরু : ভানুমতী কোথায় এখন—বাড়ী এনেছো ?

বানোয়ারী : না, নারসিং হোমে আছে—আজ বাড়ী আসবে।

গুরু : কখন আনবে আর ?

বানোয়ারী : ইখান থিকে ফিরে যাবার পথে।

গুরু : তাহলে আর বোসে আছো কেন ? এসো তুমি, ভানুমতীকে বোলো,

আমি খুউব খুশী হয়েছি।

[বানোয়ারী গুরুদেবকে ও শুভ্রাকে প্রণাম করে, সামান্য হেসে শ্রাবণীকে নমস্কার করে।]

এসো।

শ্রাবণী : আসুন।

[বানোয়ারী চলে যায়। গুরুদেব-শ্রাবণীর অসমাপ্ত কথা শুরু হয় আগেকার কথার রেশ ধরে]

আমি তাহলে সব ব্যবস্থা করছি গুরুদেব – ওদিন আসতেই হবে আপনাকে।

গুরু : যাবো। তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে তোমার বাড়ী নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে—নিশ্চয়ই যাবো—কিন্তু একটা কথা, তোমার হাতের রান্না খেলে, আমার জাত যাবে ভাবলে কি করে? জাত কি? কার জাত যায়? কুসংস্কার আমাদের অন্ধ করে ফেলেছে শ্রাবণী—আমাদের ভীতগ্রস্ত করেছে—আমাদের মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে দিয়েছে—মানুষের জাত কি কখনো যায়? জাত যায় দুর্বল মানুষের—দুর্বল মনের—যার মন দুর্বল যার মন নোংরা অপবিত্র সে ব্রাহ্মণই হোক আর চণ্ডালই হোক তার জাত গেছে জানবে—তার ছায়াও মাড়াবে না।

শ্রাবণী : কিন্তু—

গুরু : কিন্তু কি? মিত্তির-বাড়ী ভাত খেয়ে মানুষ হয়েছি আমি, আমার জাত তো তবে কবেই গেছে।

[গুরুদেব হাসেন শুভ্রার দিকে তাকিয়ে। শুভ্রার ঠোঁটের কোণে খুশীর হাসি।]

আমি বলছি, পুরো একটা দিন থাকলে তোমাদের ওপর অত্যাচার করা হবে না?

[গুরুদেবের কথায় শ্রাবণী অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়]

শ্রাবণী : কি বলছেন আপনি গুরুদেব! এতোবছর ধরে শুধু একটা দিন

আপনার সেবা করবো বলে আমি যে দিন শুনছি গুরুদেব—আমার আশা—

গুরু : কেন আগামী সোমবার সন্ধ্যেয় যাবো তোমার বাড়ী—মঙ্গলবার সন্ধ্যের আগে চলে আসবো—পুরো একদিনই হলো। মঙ্গলবার তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বলছিলে ?

শুভ্রা : হ্যাঁ।

শ্রাবণী : কালকে অনেক লোকের মধ্যে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারিনি গুরুদেব—

গুরু : বলো ?

শ্রাবণী : কিরীটকে কেমন দেখলেন গুরুদেব ?

গুরু : ভালো। ঠিকমতো মানুষ কোরো—বড়ো হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্রাবণী : আপনার আশীর্বাদ গুরুদেব।

গুরু : তোমার সবাই মিলে আমাকে বড়ো উঁচুতে তুলতে চাইছো শ্রাবণী—আগে দেখো, আমি সেখানে উঠবার যোগ্য কিনা ? আমি কে ? কতটুকু আমি ? কাউকে আশীর্বাদ করবার ক্ষমতা কোথায় আমার ? সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধরো—তাঁর কাছে যা চাইবার আছে চাও।

[ঘরে কয়েক মুহূর্তের নীরবতা।]

তুমিও আজ এসো শ্রাবণী—বেশ রাত হয়েছে।

শ্রাবণী : আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন গুরুদেব ? আমি—

গুরু : না-না, তাড়িয়ে দেবো কেন ? এতো তোমাদের নিজেদেরই জায়গা—এতোদিন বাদে মাত্র দু'চার দিনের জন্ত তোমার একমাত্র ছেলে এসেছে তাকে গিয়ে আদরযত্ন করো—এতো তোমার কাছে তার ন্যায়সঙ্গত দাবী—ও থেকে একটা প্যাকেট নিয়ে যাও, তোমার ছেলে নিশ্চয়ই মিষ্টি খেতে ভালোবাসে ?

[গুরুদেবের কথায় সামান্ত হেসে একটা প্যাকেট নেয় শ্রাবণী।]

হোস্টেলে যাবার আগে আর একদিন ওকে নিয়ে এসো—কবে যাবে

বললে যেন ?

শ্রাবণী : পরশু—কাল নিয়ে আসবো।

গুরু : এসো।

[প্যাকেট্ রেখে গুরুদেবকে ও শুভ্রাকে প্রণাম করে শ্রাবণী। প্যাকেট নিয়ে চলে যাবার সময় দরজায় দেখা হয়ে যায় মন্ত্রী অমূল্য বোসের সঙ্গে। হেসে হাত তুলে দুজনে দুজনকে নমস্কার করে। শ্রাবণী চলে যায়। অমূল্য বোস ঘরে ঢুকে গুরুদেবকে প্রণাম করে বলে]

অমূল্য : আশীর্বাদ করুন গুরুদেব, যে কাজের ভার আমি আজ পেয়েছি, আমি নিজেকে যেন তার যোগ্য করে তুলতে পারি।

গুরু : আশীর্বাদ নয়—আশীর্বাদ নয় বোস, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি, তিনি যেন তোমাকে দিয়ে তাঁর কঠিন কাজগুলো করিয়ে নেন—সকালের কাগজ দেখে কি যে আনন্দ পেয়েছি আজ—শুভ্রাকে গৌতমকে কতোবার তোমার কথা বলেছি।

[শুভ্রাকে হাত জোড় করে নমস্কার করে অমূল্য। শুভ্রা হেসে প্রতি-নমস্কার জানায়।]

আপনি কি করে ভবিষ্যদ্ বাণী করলেন গুরুদেব ? কি করে জেনেছিলেন আমার ভবিষ্যৎ ?

[গুরুদেব সামান্য হাসেন।]

এবার আমার কাজ কি, কর্তব্য কি আপনি বলে দিন—পথের সন্ধান দিয়েছেন—কি করে পথ চলবো বলে দিন !

গুরু : তোমার পথ তোমার কর্তব্য তোমার অজানা নয়, আমি কিছু বললে সেটা আমার অনধিকার উপদেশ হবে—তুমি পারবে, তুমি পারবে বোস—আমার চেয়ে হাজার গুণ শক্তি তোমার দেহে—মনে—তুমি নিজেই চলতে পারবে—আর সেইটাই উচিত হবে, নয় কি ?

অমূল্য : গুরুদেব !

গুরু : হ্যাঁ বোস, যার শক্তি থাকে ক্ষমতা থাকে সে অনেক কিছুই করতে পারে —বিরাট কিছু করতে পারে—ধর্মে বিজ্ঞানে রাজনীতিতে এমন এক একটা মানুষ আসে ইতিহাসের মোড় একেবারে ঘুরে যায়—মানুষ চাই বোস—মানুষ চাই—খাঁটি ইস্পাত দিয়ে তৈরী শক্ত পবিত্র মানুষ চাই—এতো লোক আজ ধুকছে এদের টেনে পাঁক থেকে তুলতে শক্তিশালী মানুষ চাই—সকলের খাদ্য জোগাতে বাসস্থান জোগাতে নিরাপত্তা দিতে মানুষের মতো মানুষের আজ বড়োই অভাব বোস—খাটি মানুষ মিলছে না। আজ দেশে—দুর্ভিক্ষ মহামারী অরাজকতা অজ্ঞতা দুর্নীতির হাত থেকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার মতো লোক কোথায় বলো? ধর্ম ধর্ম করে চেঁচাবার দরকার নেই—সমাজ-সংস্কারকের দরকার নেই – দরকার শক্তিশালী সরকারের—দরকার শক্তিমান জাতীয় নেতার—পারবে সে জায়গা দখল করতে—আছে শক্তি?

[নির্নিমেষ দৃষ্টিতে গুরুদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছিলো বোস, গুরুদেবের জিজ্ঞাসার উত্তরে যন্ত্রচালিতের মতো সে বলে।]

অমূল্য : পারবো।

গুরু : এগিয়ে যাও। একের পর এক কাজ এসে ভীড় করে দাঁড়াবে—অনেক কাজ – শক্ত কাজ—আমাদের দেশের লোক কতো অসহায়, কতো বোকা কতো দুর্বল তোমার অজানা নয়—এদের নিয়েই তোমার কারবার—ফাঁকি না দিয়ে এদের জন্য সত্যিকারের কিছু করবার চেষ্টা কোরো—দলের ওপরে দেশের কথা, এদের কথা ভেবো—এরা তোমাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে। এতো বেশী দুঃখ কষ্ট অভাব অনটন বঞ্চনা প্রতারণার মধ্যে এতো বেশী মানুষ শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার জন্য প্রতিমুহূর্তে এমনি লড়াই আর কোথাও করছে না – আমার অনুরোধ বোস, এদের কথা কখনো ভুলো না।

অমূল্য : আপনি আশীর্বাদ করুন গুরুদেব এদের সেবাই যেন আমি করতে পারি।

গুরু : আমার সে ক্ষমতা নেই—সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে আশীর্বাদ চাও তিনি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন—তিনি তোমাকে শক্তি দেবেন। যখন দেখছো শক্তি হারাচ্ছো সরে দাঁড়াবে। আমাদের দেশের রাজনীতিতে বড়ো নোংরামি, বড়ো দুর্গন্ধ, বড়ো বেশী বাজে লোকের ভীড়। এদেশে শিশুর খাদ্য পাওয়া যায় না, পূর্ণাঙ্গ মানুষের খাদ্যে বিষাক্ত ভেজাল, বাঁধ ভেঙ্গে এদেশের হাজার হাজার লোক ভেসে যায়, দুর্ভিক্ষ-মহামারী-দাঙ্গায় এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক মারা পড়ে -সবকিছুর জন্য দায়ী এদেশের রাজনীতি--শক্তিসঞ্চয় করে আমূল পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করো—দেখবে ঈশ্বর মাটিতে নেমে এসে তোমাকে জড়িয়ে ধরবেন। আমার এখানে এসে সময় নষ্ট করবার দরকার নেই, সেই সময় বরং দু'দশজন সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশে তাদের দুঃখ কষ্টের কথা জেনে নিও, তারপর সেগুলো ঘোচাবার জন্য আইন করো, কাজের মতো কাজ হবে।

অমূল্য : আপনার আশীর্বাদ পেলে—

গুরু : বোকার মতো বারবার এক কথার পুনরাবৃত্তি কোরো না বোস আমি কে? দুহাতের মুঠো বজ্রের মতো শক্ত করো—স্থির হয়ে শক্ত পায়ে দাঁড়াও—বুকে সাহস আনো—চোখ কান সজাগ রাখো—মস্তিষ্ক নির্মল করো—তারপর মন পবিত্র করে ফলাফল না ভেবে নিজের কাজ করে যাও—আমার আশীর্বাদ নেবার জন্য এখানে আসবার দরকার নেই।

[গুরুদেবের দু'পা জড়িয়ে ধরেছে বোস]

অমূল : গুরুদেব ! গুরুদেব !

গুরু : কি হলো ?

অমূল্য : সারাদিন—সারা সপ্তাহের ক্লেদ গ্লানি ক্লান্তি নোংরামি ভুলতে আপনার পায়ের তলায় এসে কিছুক্ষণ বসবার অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না গুরুদেব। পিছিয়ে-পড়া মনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে আসতেই হবে গুরুদেব।

[গুরুদেব হেসে বলেন]

গুরু : এসো তাহলে—পেট্রোল পাম্পে। পাম্পের ট্যাঙ্ক কিন্তু শুকনো। নাও, ওগুলো নিয়ে যাও—আগরওয়ালের ছেলে হয়েছে—গোটাকয়েক রেখে দাও—গৌতম কোথায়? ডাকো। [গুরুদেব মিষ্টির প্যাকেটগুলো দেখিয়ে বোসকে বলেন আর শুভ্রাকে বলেন ওথেকে কয়েকটা রেখে দিতে এবং গৌতমকে ডেকে দিতে। শুভ্রা ভেতর থেকে একটা শ্বেত পাথরের বাটি এনে কয়েকটা মিষ্টি তাতে রেখে দেয়। গৌতম এসে দাঁড়িয়েছে।] একেবারে ছেলেমানুষ, কতো মিষ্টি এনেছে ছাখো—তুমি এসে গেলে ভালোই হলো। ওর গাড়ীতে এগুলো তুলে দিয়ে এসো।

অমূল্য : আমাকে সব দিচ্ছেন কেন? কি হবে অতো?

গুরু : যাও, রেখে এসো।

অমূল্য : না না, ও কেন কষ্ট করবে—আমি নিয়ে যাচ্ছি।

গুরু : আস্থক রেখে—তুমি বসো।

[গৌতম প্যাকেটগুলো নিয়ে যায়।]

অমূল্য : এতো মিষ্টি নিয়ে আমি কি করবো গুরুদেব?

গুরু : আমিই বা কি করবো? আমার ঘরে যারা আসে তারা সবাই খেতে পায় ওসব—প্রয়োজনের অতিরিক্তই খেতে পায়—তোমার ঘরে দূর দূর থেকে যারা দুঃখ-দুর্দশার কথা বলতে আসে তাদের কাছে যে এগুলো স্বপ্ন বোস—তাদের দিও।

[গুরুদেবের ধরাগলার কথা শুনে আর কোনরকম প্রতিবাদ করবার সাহস থাকে না অমূল্যর।] হ্যাঁ, তোমার দেশে একবার যাবো—ঘুরে দেখে আসবো—দশ-বারো বছর আগে তোমাদের ওদিকটায় একবার গিয়েছিলাম—শুনেছি সব নাকি পালটে গেছে—আসবো আর একবার ঘুরে।

অমূল্য : আমি ধন্য হবো গুরুদেব—কবে যাবেন বলুন, সব ব্যবস্থা আমি করছি।

গুরু : তাড়াতাড়ির কিছু নেই—তুমি এখন যাও—কিছুদিন যাক।

[গৌতম এসে ঘরে ঢোকে]

অমূল্য : ওর কষ্ট হলো, আমিই রেখে আসতে পারতাম।

গুরু : মিষ্টির প্যাকেট বইতে যদি কষ্ট একটু হয় হোক না? ও নিয়ে ভেবো না—যারা দিনরাত মোট বইছে—কয়লা তুলছে—পাথর ভাঙছে—লোহা পিটছে—তাদের কথা ভাববে—তুমি মন্ত্রী। এসো আজ, অনেক রাত হয়েছে। [গুরুদেবকে প্রণাম করে গুরুমাকে নমস্কার করে অমূল্য বোস চলে যান। রশ্মি এসে ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়েছে তার হাতে শ্বেত পাথরের গ্লাসে একগ্লাস সরবৎ।]

গৌতম।

গৌতম : গুরুদেব।

গুরু : এবার যে তোমাকে বাইরে বেরিয়ে পড়তে হবে।

গৌতম : বাইরে?

গুরু : হ্যাঁ। চোখকান খুলে গোটা ভারত একবার ঘুরে দেখে এসো—বই পড়ে, ইউনিভার্সিটি থেকে কিছু কিছু পুঁথিগত বিদ্যে হয়তো আয়ত্ত করেছো—যে দেশে তুমি জন্মেছো—যে দেশের নাগরিক তুমি, তাকে জানতে-বুঝতে-চিনতে হবে না? দু'বছরের সময় নাও—যতো পারো ঘুরে এসো—যতো পারবে দেখবে—যতো কিছু সুন্দর আছে দেখবে—যতো কিছু কুৎসিত আছে দেখবে—তফাৎটা কোথায় সেটাও বুঝবার চেষ্টা করবে—দুই-ই দেখবার কিন্তু কোন কিছুতে একেবারে বিলীন হয়ে যাবে না—আমার অবর্তমানে আমার কিছু কিছু কাজের ভার হয়তো তোমাকে নিতে হবে—তৈরী থাকতে হবে তোমাকে। তুমি ফিরে এলে এরা যে প্ল্যান অ্যানড প্রোগ্রাম নিয়েছে সেই নিয়ে আমি চিন্তা করবো।

গৌতম : কিন্তু—

গুরু : থামলে কেন ? বলো কি বলতে চাও ? বলো ?

গৌতম : আমি যোগ্য কি না!

গুরু : জন্মেই কেউ কোন কাজের যোগ্য হয় না—নিজেকে যোগ্য করে নিতে হয়—ক্ষমতা অর্জন করতে হয়—কঠোর পরিশ্রম করতে হয়—সময় চাই—অভিজ্ঞতা চাই—জ্ঞান চাই—সবচেয়ে বড়ো জিনিস শক্তি চাই—মনের শক্তি—যোগ্য তোমাকে হতে হবে—নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে—আমি তো রয়েছি।

গৌতম : কবে বেরুতে হবে আমাকে ?

গুরু : বলবো—তুমি তৈরী থেকো। কিরে পাগলী দাঁড়িয়ে কেন ? দে।

[পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো রশ্মি। সে কাঁপছে। নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে রশ্মি কিন্তু গুরুদেবের চোখের দিকে তাকাতে পারে না। মাথা নিচু করেই সরবৎ দেয়। গুরুদেবের দৃষ্টি রশ্মির এই হঠাৎ চাঞ্চল্য এড়ায় না। সরবৎ খেয়ে গ্লাস ফেরত দিলেন গুরুদেব।] চলো কালকের তর্কটা শেষ করি।

[গুরুদেব ভেতরে চলে যান। তাঁর পেছনে যায় গৌতম। যাবার সময় একবার সে ফিরে তাকায়। সে দেখতে পায় রশ্মির চোখে জল। রশ্মিকে বুঝবার ক্ষমতা আজও গৌতমের হয়নি। রশ্মির দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বেদীটার ওপরে। সে দৃষ্টিতে হিংসা ঈর্ষা-হিংস্রতা। এগিয়ে যায় রশ্মি—বেদীতে বসতে যায়—অনেক কিছু ভাবে। একসময় বসেও পড়ে পা তুলে। একটা তাচ্ছিল্য একটা অবহেলা একটা অহঙ্কার ভাব তার চোখে মুখে। শুভ্রা এসে ভেতরের দরজায় দাঁড়ায় এবং রশ্মিকে বেদীতে বসতে দেখে বিস্মিত হয়। রশ্মি কিন্তু মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়েছে।]

শুভ্রা : কিরে! কি করছিস ? কি হয়েছে ?

[ছুটে ভেতরে চলে যায় রশ্মি শুভ্রাকে পাশ কাটিয়ে। রশ্মিকে ডাকে শুভ্রা] রশ্মি! রশ্মি!

[বাইরের দরজায় সেই সময়ই দেখতে পাওয়া যায় শঙ্কর মিত্রকে। শঙ্কর পাশে শুভ্রাকে ডাকে]

শঙ্কর। শুভ্রা!

[রশ্মিকে ভুলতে হয় শুভ্রার, শঙ্করের দিকে সে ফেরে]

শুভ্রা: কে?

শঙ্কর: আমি—চিনতেই পারছো না যে? তাজ্জব কি বাৎ!

শুভ্রা: আজকাল এতো ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করছো কেন?

শঙ্কর: বললে বিশ্বাস করবে?

শুভ্রা: শুনি আগে?

শঙ্কর: তোমাকে দেখতে।

শুভ্রা: আমায় দেখতে না আরো কিছু—আমি জানি।

শঙ্কর: কি জানো?

শুভ্রা: গৌতমের জন্য।

[শঙ্করের ঠোঁটের কোণে হাসি।]

ভাবছি, বাড়ীটা বিক্রি করে এবার আশ্রমে এসেই উঠবো—গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নেবো—ভক্ত শিষ্য তাঁর আর একজন বাড়বে।

শুভ্রা: দীক্ষা নেবে তুমি?

শঙ্কর: হ্যাঁ। বিশ্বাস হচ্ছে না?

শুভ্রা: গুরুদেব রাজী হবেন কেন!

[শঙ্কর আবার হাসে। শঙ্করের হাসি সেই মুহূর্তে যেন চাবুক কশায় শুভ্রাকে।]

হাসলে যে?

শঙ্কর: গুরুদেব কি তোমার কথামতো চলবেন নাকি? আমি একবার বললে তিনি রাজী হবেনই—ডু ইউ ওয়াণ্ট টু সি?

শুভ্রা : রাজী হলেও আমি তোমায় এখানে থাকতে দেবো না—গৌতমের ভবিষ্যৎ—

শঙ্কর : আমি কাছে থাকলে অন্ধকার হয়ে যাবে ?

শুভ্রা : হ্যাঁ তাই।

শঙ্কর : আমি সংক্রামক রোগের জীবাণু বয়ে বেড়াই নাকি যে আমার সংস্পর্শে এলেই তোমার ছেলে রোগে পড়বে— ভুলে যেও না, আমি তার বাবা।

শুভ্রা : হ্যাঁ, বাবার কাজই তো তুমি করেছো—দুহাতে টাকা উড়িয়ে ফতুর হয়েছো—হাজার রকমের নেশা করে শরীরটাকে রোগের ডিপো বানিয়েছো —না, তুমি যেখানে আছো সেখানেই থাকো—এ জায়গা তোমার নয়—এখানে তুমি থাকবে না—বাড়ীও বিক্রি করা চলবে না।

শঙ্কর : সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে সবকিছু ছেড়ে ছেলে মানুষ করতে আশ্রমে এসে উঠেছো—সবাই বলে, সংসার ছেড়েছে শঙ্কর মিস্ত্রিরের বৌ—আমি বাড়ী বিক্রি করলাম কি রাখলাম তাতে তুমি নাক গলাতে চাইছো কেন ?

শুভ্রা : ওটা গেলে আর রইলো কি ? থাকবে কোথায় তুমি ?

শঙ্কর : এখানে এসে উঠলে যখন তুমি চেঁচামেচি করবে তখন হোটেলে গিয়েই না হয় উঠবো—পথে বসতে তো আর পারবো না ?

শুভ্রা : পথে বসবার কি আর বাকি আছে কিছু ? কি চেহারা হয়েছে আয়নায় কখনো দেখছো ?

শঙ্কর : হয়ে এসেছে আমার শুভ্রা—একটা মোম আর কদ্দিন জ্বলবে ? যাও, গুরুদেবকে একটু ডেকে দাও।

[কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে ভেতরে চলে যায় শুভ্রা। শঙ্কর অদ্ভুতভাবে হাসে। ঘরে এসে ঢোকে গৌতম।]

গৌতম—এসো এসো—আমার কাছে এসো।

[তার ঘনিষ্ঠ হয় গৌতম। তাকে ধরে আদর করে শঙ্কর তার গায়ে মাথায় কাঁধে হাত বুলিয়ে।]

গৌতম : কেমন আছেন ?

শঙ্কর : অ্যাঁ! আমি—ভালো- ভালো আছি—খুউব ভালো আছি।

গৌতম : আপনার চেহারা আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়ে গেছে।

শঙ্কর : আমার! কোথায়! না—না—না—একই রকম আছি—তুমি—তোমার মা—তোমরা সবাই ভুল দেখছো।

গৌতম : সত্যিই খারাপ হয়েছে—একটু যত্ন নিন।

শঙ্কর : যত্ন ? নেবো— নেবো—নিশ্চয়ই যত্ন নেবো—অনেক দিন বাঁচতে হবে আমাকে গৌতম—অনেক দিন বাঁচতে হবে।

[গুরুদেব ভেতরের দরজায়, সঙ্গে শুভ্রা।]

গুরু : শঙ্কর।

[গুরুদেবের ঠোঁটর কোণে মিষ্টি মধুর হাসি। শুভ্রারও।]

শঙ্কর : এসো তুমি—গুরুদেবের সঙ্গে দুটো কথা বলি।

[গৌতম ভেতরে চলে যায়।]

শ-দুয়েক —টাকা দাও তো গুরুদেব।

[শুভ্রা বিস্মিতা।]

শুভ্রা : কেন! এতো রাত্রে— দুশো টাকা কি হবে ?

গুরু : তুমি এনে দাও।

শুভ্রা : না। কি করবে না বললে টাকা আমি ওকে দেবো না।

গুরু : শুভ্রা!

[প্রতিবাদ না করে শুভ্রা এবার টাকা আনতে ভেতরে চলে যায় কিন্তু একটা চাপা ক্ষোভে সে জ্বলতে থাকে।]

বোসো।

[দুজনে বসে গুরুদেব বেদীতে—শঙ্কর চাদরে।]

শরীরটাকে দেখছি একেবারেই ভেঙে ফেলেছো—সেদিনও তো এমনি দেখিনি ?

শঙ্কর : ঠিক ধরেছো—হঠাৎ যেন বুড়িয়ে যাচ্ছি—তুমি বললে, শুভ্রা বললো, গৌতম বললো, আমিও জানি—এটা সত্যিই গেছে আর কি! খোলশ ছাড়বার সময় তো হয়ে এসেছে, কি বলো যেন তোমরা ? বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—

গুরু : অখাদ্য কুখাদ্যগুলো ছাড়ো—দেখবে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

শঙ্কর : ওগুলো ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যে ওপরে উঠে যাবো গুরুদেব—ডাক্তার লিমিট্ রেখে খেতে বলেছে—লিমিট্ ছাড়িয়ে যায়—তুমিতো জানোই সবসময় সবকিছুর রেকর্ড ব্রেক করাটাও আমার একটা বদ নেশা—বুঝি সবই কিন্তু নিজেকে কনট্রোল করতে পারি না।

[ঘরে কয়েক মুহূর্তের অবাঞ্ছিত নীরবতা।]

গুরু : গৌতমকে এবার ভাবছি বছর দুয়েকের জন্য ভারত ভ্রমণে পাঠাবো —ঘুরে সব দেখে আসুক—অনেক কাজ করবার ইচ্ছে আছে ওকে দিয়ে—আমিও আর কদিন ?

শঙ্কর : যা খুশি তোমার করো—আমি মানুষ করতে পারবো না জেনেই শুভ্রা ওকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছে, আমি ও নিশ্চিন্ত হয়েছি,—ও দেশভ্রমণে গিয়ে দেশ উদ্ধার করলো কি গোল্লায় গেলো তার জন্য শুভ্রার কাছে তোমাকেই জবাবদিহি করতে হবে—আমাকে নয়। ওর মালিক আজ তুমি—আমি নই।

[কেঁপে উঠেছেন গুরুদেব। অদ্ভুত একটা ভাবান্তর শুরু হয় গুরুদেবের মনে —বাইরে থেকে যার বিন্দুবিসর্গও কেউ টের পাবে না।]

আমি ওর বাবা—মুক্ত মানুষ—পৃথিবীর কোন বন্ধনের মধ্যে নেই—থাকতেও চাই না—এমনি দুঃখ তো রয়েছেই—জড়ালে আরো দুঃখ—কি ভাবছো—

কোন বাঁধন নেই অথচ এখানে কেন? শুভ্রা—শুভ্রা—মাঝে মাঝে ভীষণ ভাবে টেনে আনে—আর আনে একজন।

গুরু: কে সে?

শঙ্কর: সে আজকের গুরুদেব আনন্দ গোস্বামী নন—সে আমার অতীতের পরমাত্মীয় দেবব্রত গোস্বামী।

[শুভ্রা টাকা এনে শঙ্করকে দেয়। পকেটে রাখতে রাখতে কথা বলে শঙ্কর]

গাড়ীটাও ভাবছি বেঁচে দেবো—পুরোনো হয়ে গেছে—চালাতে গেলে হাত-পাও ভীষণ কাঁপে—কখন অ্যাকসিডেনট্ করে বসবো!

গুরু: হ্যাঁ, ওটা বিক্রিই করে দাও।

শঙ্কর: চলি, তোমাদের বিরক্ত করে গেলাম—নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়েছি, এবার পালানোই ভালো—কি রকমভাবে তাকাচ্ছে দেখো? তুমি ভেতরে গেলে হয়তো কেড়েই নেবে। চলি!

[হেসে শুভ্রার দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ করে চলে যায় শঙ্কর মিত্র। ঈষৎ ঝাঁঝালো গলাতেই কথা বলে শুভ্রা।]

শুভ্রা: কেন আপনি ওকে এতো প্রশ্রয় দেন গুরুদেব?

[গুরুদেব তার কথার উত্তর না দিয়ে কয়েক মুহূর্ত মাটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর মাথা তুলে ওপরের দিকে তাকিয়ে শুভ্রাকে উদ্দেশ করে বলেন। শুভ্রা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে গুরুদেবের দিকে।]

গুরু: শুভ্রা—শুভ্রা—তুমি বুঝবে না শুভ্রা, কেন—কেন ও এসে চাইলেই আমি ওকে টাকা দিই—তুমি ভাবো, এ আমার দুর্বলতা—কিন্তু যাকে আমি পাঁচ দশ হাজার টাকা ছেঁড়া কাগজের মতো ওড়াতে দেখেছি—স্যুট্-এর রং-এর সঙ্গে গাড়ীর রং মিলিয়ে বাইরে বেরুতে দেখেছি—পনর বছর বয়সে বাবা মাকে হারিয়ে যার বাড়ীর ভাত খেয়ে আমি মানুষ হয়েছি—যার বাবার টাকার আমি লেখাপড়া শিখেছি—যে আমাকে জোর করে ডক্টরেট্ ডিগ্রী

নিতে বিলেত পাঠিয়েছে—যার লাইব্রেরীতে বসে আমি আলোর সন্ধান পেয়েছি—সে যদি আমার কাছে এসে মাত্র দুশো টাকার জন্য হাত পেতে দাঁড়ায় আমি কি তাকে ফেরাতে পারি? ওর স্ত্রী তুমি—ওর সবকিছুই তো তুমি জানো—নিজের বুকে হাত রেখে বলোতো ওকে দেখলে আজ তোমার মায়া হয় না?

শুভ্রা : হয়। কিন্তু—

গুরু : কিন্তু কি বলো?

শুভ্রা : আপনার আরো কতো পুরোনো বন্ধু আসে—অসৎ পথ বেছে নিয়েছে বলে তো আপনি তাদের তাড়ান— ওকেও তাদেরই দলের একজন ভেবে কেন তাড়াবেন না।

গুরু : শুভ্রা! কি বলছো তুমি শুভ্রা? ওকি তাদের দলে?

শুভ্রা : কিন্তু তাতেই হয়তো ওর পরিবর্তন আসতো—আপনার কাছে আঘাত খেলে ও নিজেকে বদলাতে বাধ্য হতো।

গুরু : এ তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা শুভ্রা, ওকে আজও তুমি চিনতে পারোনি বলেই ওকথা ভাবতে পারছো—তুমি ভেতরে যাও—আমি একটু অশান্ত হয়েছি আমাকে উত্তেজিত কোরো না।

শুভ্রা : আমি?

গুরু : না শুভ্রা তুমি নও—শঙ্করও নয়—রশ্মি—রশ্মি আমাকে অশান্ত করেছে—রশ্মির চোখের ভাষা আমাকে অশান্ত করেছে।

শুভ্রা : রশ্মি!

গুরু : হ্যাঁ শুভ্রা, ও দুর্বোধ্য ছিলো আজ বোধ্য হয়েছে—ও যা বলতে চা[illegible] চোখ আজ আমাকে তাই বলে দিয়েছে—তুমি যাও—তুমি যাও শুভ্রা—আমার বিবেক—আমার বিবেকও আজ আমাকে অশান্ত করেছে—কাউকে সহ্য করতে পারছি না আমি—মস্তিষ্কের ভেতরে একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করছি—তুমি যাও।

[অশান্ত গুরুদেবের দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে শুভ্রা। মঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে।]

॥ সাত ॥

[প্রবাল গুপ্তের পড়বার ঘরে শুধু টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। বইএর আলমারী থেকে একটা বই নিয়ে এসে ইজিচেয়ারে বসে পড়তে আরম্ভ করেছেন গুরুদেব। বেশ রাত হয়েছে। শ্রাবণী এসে বাইরের দরজায় দাঁড়িয়েছে। আস্তে আস্তে সে গুরুদেবের কাছে এগিয়ে এসে শান্ত গলায় বলে]

শ্রাবণী। এত রাত হোলো এখনো ঘুমোন নি গুরুদেব?

গুরু: ঘুমোতে আর দিলেন কোথায়?

শ্রাবণী: কে?

গুরু: তোমার স্বামী।

শ্রাবণী: কেন? তার তো নাইট ডিউটি, কখন বেরিয়ে গেছে।

গুরু: আরে না-না—আমি তাঁর কালেকশানের কথা বলছি—চমৎকার কালেকশান!

শ্রাবণী: আপনার পড়বার মতো বই এখানে একখানাও নেই—সব অপরাধ-বিজ্ঞানের বই।

গুরু: তাতে কি? ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান-মনস্তত্ত্বও যেমনি জানবার জিনিস, অপরাধ-বিজ্ঞানও তাই—এও এক অদ্ভুত বিজ্ঞান—ভালো খারাপ ছোট

বড়ো আমরা সবাই যে এতে অংশ নিয়ে আছি শ্রাবণী—কম বেশী এই যা তফাৎ। কত রকমের পাপ, কতো রকমের অপরাধ যে রোজ পৃথিবীতে ঘটছে শ্রাবণী তার কতটুকুর খোঁজ আমরা রাখি? অবাক হতে হয় এগুলো পড়ে—কি বিচিত্র এক জগৎ, কতো বিচিত্র মানুষ—মানুষ যে কতো জঘন্য, কতো বর্বর, কতো নিষ্ঠুর, কতো পাশবিক, কতো নৃশংস হতে পারে তার প্রমাণ এগুলো—সময় পেলে পড়ে দেখো—এ এক বিস্ময়কর, রোমাঞ্চকর জগৎ।

[শ্রাবণীর কিন্তু ভালো লাগে না গুরুদেবের কথা।]

অপরাধ-বিজ্ঞান নিয়ে আমিও এককালে কিছু কিছু পড়াশুনা করেছিলাম, অবিশ্যি তোমার স্বামীর তুলনায় সে অতি সামান্যই—অনেক নতুন বই দেখলাম এখানে—দুখানা শেষও করলাম।

শ্রাবণী : দুখানা শেষ করলেন।

গুরু : হ্যাঁ। যাও, তুমি গিয়ে ঘুমোও।

শ্রাবণী : আপনি?

গুরু : শেষ করি এখানা—রাত জাগাতো আমার অভ্যেস আছে জানোই—তুমিও কি রাতে ঘুমোও না নাকি?

শ্রাবণী : রাতে আমি ঘুমোতেই পারি না গুরুদেব—সারারাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করি—ঘুম আসে না। গুরুদেব—

গুরু : বলো।

শ্রাবণী : ওর কি পরিবর্তন আসবে না গুরুদেব?

গুরু : কার কথা বলছো?

শ্রাবণী : আমার স্বামীর।

গুরু : সকলের ইচ্ছে সকলের পথ তো এক নয় শ্রাবণী—তোমার স্বামী শিক্ষিত—প্রতিষ্ঠিত তাঁকে তাঁর পথে এগুতে দাও—ঘুম আসবে না কেন? আশ্চর্য!

শ্রাবণী : আমাদের পথ যে দিন দিন বড়ো বেশী আলাদা হয়ে যাচ্ছে গুরুদেব—আপনার পায়ে মাথা রেখে আমি শান্তি পেয়েছি, কিন্তু যখনি ওর কথা ভাবি, ভয় ভাবনা জ্বালা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে—আমাদের সম্পর্ক আমাদের ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠি। আপনাকে আমি বিরক্ত করছি?

গুরু : না না, বলো।

শ্রাবণী : আমি কি করবো আমায় বলে দিন?

গুরু : সংসার সবার আগে শ্রাবণী—তোমার স্বামীকে দেখে ছেলেকে দেখে তাতে যদি বাড়তি সময় থাকে তাহলে অন্যের কাছে যাবে—সংসারেই শান্তি, সংসারেই অশান্তি, এই স্বর্গ, এই নরক—দুইই আমাদের মনগড়া—মনটাকে সংযত করো—দুজনের পথ এক করো।

শ্রাবণী : দুজনের পথ যদি সম্পূর্ণ আলাদা হয় তাকে এক কিকরে করবো গুরুদেব?

গুরু : একটু গুছিয়ে বলো।

শ্রাবণী : আমি অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে গুরুদেব—অশিক্ষিতাই ছিলাম—ওই আমাকে শিক্ষিতা করেছে—একটু একটু করে সবকিছু বুঝবার ক্ষমতা যখন আমার হলো সেদিন দেখলাম মন্ত্র পড়ে যাকে আমি স্বামী বলে স্বীকার করেছি—নিজের অজ্ঞাতে যাকে আমি গভীরভাবে ভালোবেসেছি, তার পথ আমার পথ, তার চিন্তাধারা আমার চিন্তাধারা একেবারেই আলাদা—আমার শিক্ষাই আজ আমাকে ওর কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছে। [গুরুদেব শুনছেন শ্রাবণী বলে চলেছে।] কালচারাল কনফ্লিকট্ অ্যাভয়েড করবার চেষ্টা করেছি—যতদূর সম্ভব, যতটা সম্ভব টেমপারামেণ্টাল অ্যাডজাস্টমেণ্ট করে চলবার চেষ্টা করেছি—অনেক কিছু স্যাকরিফাইস্ করেছি তবু—তবু কেন সে এমনি হলো গুরুদেব•• ফ্ল্যাটারি করে যে প্রোমোশান আদায় করে—ঘুষের টাকায় যে স্ত্রীর নামে বাড়ী-গাড়ী

জমি-জায়গা করে তার সঙ্গে অতি সাধারণ স্কুলমাস্টারের মেয়ে আমি আমার চলা কি সম্ভব? সবদিক দিয়ে মন আমার বিষিয়ে গেলো।

[গুরুদেব নিরুত্তর।]

এমনি সময় আপনার দেখা পেলাম—জ্বালা ভুলতে জলে ঝাঁপ দিলাম কিন্তু সেখানেও ও রইলো আমার পেছনে - ও চায় না আমি আপনার কাছে যাই —ও চায় না আমি আপনার সেবা করি।...একদিন নতুন নতুন গয়না পেয়ে কি খুশীই না হতাম আমি—নিজের নামে বাড়ী-গাড়ী পেয়ে মন আমার ভরে উঠতো—মনে হোতো, আমার মতো সুখী কে—কিন্তু আজ শুধু জোড়াতালি দয়ে কোনরকমে আমরা আমাদের সম্পর্কটা জিইয়ে রেখেছি।

গুরু : নিজের জীবন জটিল করো না শ্রাবণী—দুঃখ পাবে।

শ্রাবণী : জানি গুরুদেব—সরল করি কি করে?

গুরু : তুমি একদিন তোমার স্বামীকে আমার সঙ্গে দেখা কোরতে বোলো—কেউ থাকবে না—তুমিও না—একা।

শ্রাবণী : মরে গেলেও সে আপনার কাছে যাবে না গুরুদেব—এতোদিন বাদে আজ আপনি আমাদের বাড়ীতে এসেছেন কতো আনন্দ আজ অথচ নাইট ডিউটির নাম করে আপনি আসবার আগেই চলে গেছে—বলে গেছে আপনি চলে গেলে তবে ফিরবে—সে আপনাকে ঈর্ষা করে গুরুদেব—সে—সে আজ—[দৃঢ় সংযত কণ্ঠে গুরুদেব বলেন]

গুরু : তোমার স্বামী অন্ধ নয় শ্রাবণী—অন্ধ তুমি।

শ্রাবণী : আমি!

গুরু : হ্যাঁ—তুমি। তাঁর পরিবেশে থেকে আর সবাই যা করে তাই সে করেছে—আমাদের শাসনব্যবস্থা এর জন্য দায়ী—দায়ী আমাদের ঘুণে ধরা সমাজ—তোমার স্বামী দায়ী নয়—স্বীকৃত অপরাধ সে করছে—সে অপরাধী নয়—সে অপরাধের শিকার—কিন্তু তুমি তুমি যে তার চেয়ে অনেক বেশী অপরাধী।

শ্রাবণী : আমি !

গুরু : হ্যাঁ—তুমি। সে তোমাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ জ্ঞানের দরজা খুলে দিয়েছে—আলো কি জানবার সুযোগ দিয়েছে,—জানিয়েছে সেই আলো দিয়ে তার অন্ধকার দূর না করে তুমি তাকে বিচার করেছো—কাছের মানুষকে আরো কাছে না টেনে দূরে সরিয়ে দিয়েছো।

শ্রাবণী : গুরুদেব !

গুরু : আমি তোমার গুরু নই শ্রাবণী—অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের অন্ধকার গহ্বরে বন্দী ছিলে তুমি সেখান থেকে মুক্ত হতে যে তোমাকে সাহায্য করেছে সেই তোমার গুরু।

শ্রাবণী : গুরুদেব !

গুরু : বছরের পর বছর একসঙ্গে থেকেও তাঁর বাঁকা মেরুদণ্ড সোজা করবার চেষ্টা কেন করোনি ? তাঁকে তোমার নিজের মতো করে না নিয়ে ঘৃণা করে অবহেলা করে অবজ্ঞা করে কেন তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছো ? সে তোমার গুরু—গুরুরও দোষ থাকতে পারে—সে ঈশ্বর নয়।

শ্রাবণী : গুরুদেব !

গুরু : তুমি সত্যিই তোমার স্বামীকে ভালোবাসতে পারোনি শ্রাবণী—তুমি হেরে গেছো। হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে থেকে তোমার মতো একটা সাধারণ মেয়েকে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলবে বলে সে তোমাকে বেছে নিয়েছিলো—সে তা করেছে—সে জিতেছে—কেন জিতেছে জানো ? জানবার চেষ্টাও কখনো করেনি ? সে তোমাকে সত্যিই ভালোবেসেছে—সেখানেও তুমি হেরেছো—হাজার অপরাধ সত্বেও যে ভালোবাসতে পারে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি শ্রাবণী—আজ জোড়াতালি দিয়ে সংসার না করে কতো সুন্দর কতো সুখের সংসার তোমরা গড়তে পারতে কতো মিষ্টি মধুর সম্পর্ক হতে পারতো তোমাদের !

শ্রাবণী : আমি তো সব ছেড়েছি গুরুদেব—আমি আজ নির্লিপ্ত।

গুরু : সবকিছুর ওপর চেপে বসে সব কিছু ছেড়েছি যদি বলো, তবে তা তোমার নিজের কানে শুনতে ভালো লাগতে পারে কিন্তু যাকে বলছো সে বিশ্বাস নাও করতে পারে—নতুন করে তোমাদের সম্পর্কটা আজ ভেবে দেখবার সময় এসেছে শ্রাবণী—দেখবে গুরু ছাড়াই তোমার স্বামীর পরিবর্তন আসবে – যুদ্ধ করো…জিতবার চেষ্টা করো—কোন গুরু রাখলে রাতারাতি কারো কালো মনকে সাদা করতে পারে না—সত্যিকারের প্রেম ভালোবাসাই সেটা সম্ভব করতে পারে।

[শ্রাবণী নিরুত্তর সে স্তব্ধ হয়ে গেছে।]

তোমাকে হয়তো আমি আজ আঘাত দিলাম কিন্তু তুমিও আজ আমাকে অনেক বেশী আঘাত দিয়েছো–বড্‌ডো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—অপরকে বিচার করতে গিয়ে নিজেকে বিচার করে ক্লান্ত হয়েছি।

শ্রাবণী : আমায় ক্ষমা করুন গুরুদেব—এতো রাতে আমিই আপনাকে ক্লান্ত করেছি—আমি—

গুরু : না—না, আমরা সবাই ক্লান্ত শ্রাবণী—সবাই পরিশ্রান্ত, সবাই অথব জরাগ্রস্ত সমাপ্ত, মৃত্যুর ঘণ্টা বাজছে –নিয়তি আমাদের সব কাজে ইতি টেনে দিতে চাইছে—অপদার্থ আমরা জোর করে কাঁপতে কাঁপতে বেঁচে আছি।

শ্রাবণী : আপনি আসুন গুরুদেব—একটু বিশ্রাম করে নিন।

[শ্রাবণী গুরুদেবের বইটা নিয়ে আলমারীতে রেখে দেয়।] আসুন।

গুরু : হ্যাঁ চলো, একটু বিশ্রাম করি—শরীর আর সত্যিই বইছে না।

[গুরুদেব শ্রাবণী বাইরে চলে গেলে ভেতরের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢোকে প্রবাল গুপ্ত। অদ্ভুত একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে। শ্রাবণী এসে ঘরে ঢুকে প্রবালকে দেখে। তার বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।]

শ্রাবণী : তুমি ! তুমি ! কখন এলে তুমি !

প্রবাল : অ্যাঁ।

শ্রাবণী : কখন এলে তুমি ? তোমার গাড়ী—

প্রবাল : গাড়ীতে আসিনি।

শ্রাবণী : তবে ?

প্রবাল : গাড়ী জয়ন্তর গ্যারেজে রেখে পাঁচিল টপ্‌কে ঢুকেছি—

শ্রাবণী : কখন ? কখন এসেছো তুমি ?

প্রবাল : অনেকক্ষণ।

শ্রাবণী : এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

প্রবাল : বাড়ীতে।

শ্রাবণী : বাড়ীতে !

প্রবাল : হ্যাঁ।

শ্রাবণী : বাড়ীতে কোথায় ছিলে ? কি করছিলে ?

প্রবাল : চোরের মত দাঁড়িয়েছিলাম জানালার ওপাশে—চার ঘণ্টা।

শ্রাবণী : কি বলছো তুমি ! চার ঘণ্টা তুমি বাড়ীতে ছিলে !

প্রবাল : গুণ্ডাবদমায়েসের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করে আজ যাঁকে হাতেনাতে ধরতে এসেছিলাম তাঁর পায়ের নখের যোগ্য আমি নই সু।

শ্রাবণী : প্রবাল !

প্রবাল : কিন্তু ধরেছি আর একজনকে—যাকে আমি নিজের চেয়েও বেশী ভালোবাসি—যে আমার সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে অভিনয় করে চলেছে—তাকে।

[একটু একটু করে ভেঙে পড়ে শ্রাবণী।]

শ্রাবণী : বলো না—বলো না প্রবাল ভুল—ভুল করেছি আমি—আমি অকৃতজ্ঞ—আমি অপরাধী—কি—কি শাস্তি তুমি আমায় দিতে চাও—আমি নেবো—মাথা পেতে নেবো—আমার বিচার তুমি করো প্রবাল—

তোমার রায় আমি মানবো—তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবার অধিকার চাই আমি সেটুকু থেকে আমায় তুমি বঞ্চিত কোরো না। বলো না—বলো না—কিছু বলো না—'তোমার পাপ তোমার অপরাধ তোমার অভিনয় শেষ করে সরল হয়ে আমার কাছে থাকো তুমি'—বলবে না? বলবে না তুমি?

[শান্ত সংযত প্রবাল ধীর শান্ত গলায় বলে।]

প্রবাল : চলো, গুরুদেবকে প্রণাম করে আসি।

[আনন্দে, উত্তেজনায়, আবেগে, বিস্ময়ে শ্রাবণী থরথর করে কাঁপছে।]

শ্রাবণী : তুমি! তুমি যাবে! তুমি যাবে গুরুদেবের কাছে! তাঁকে তুমি প্রণাম করবে? প্রবাল! প্রবাল!

প্রবাল : হ্যাঁ।

শ্রাবণী : আমার বিশ্বাস হচ্ছে না—আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

প্রবাল : সমাজের নোংরা খারাপ লোক ঘেঁটে ঘেঁটে আমি যে আজ ভালো মানুষ চিনতে শিখেছি স্থ—অমৃতগুপ্তকে ক্ষমা করবার মতো ক্ষমতা তাঁর আছে আমি জেনে নিয়েছি—তাঁর কাছে আজ আমার ভয় লজ্জা সংকোচ কিছুই নেই।

শ্রাবণী : আর আমাকে? আমাকে ক্ষমা করবার মতো ক্ষমতা নেই তোমার?

[দুজনে দুজনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত]।

আমার—আমার ক্ষমা করবে না তুমি?

প্রবাল : স্থ!

[শ্রাবণীকে জড়িয়ে ধরেছে প্রবাল। তার বুকে মুখ লুকিয়ে ছোট্ট মেয়ের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে শ্রাবণী। মঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে।]

॥ আট ॥

[টেবিল ল্যাম্পের সবুজ আলোয় বিক্রম লাহিড়ীর বাইরের ঘর আলোকিত। সোফায় বসে আছে অলকা। দৃষ্টিটা তার কেমন যেন ঘোলাটে। তার ভাবভঙ্গি আচরণও ঠিক স্বাভাবিক নয়। হঠাৎ সে চাপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে ভেতরের দরজায় দাঁড়ানো বিক্রম লাহিড়ীকে দেখে, পরক্ষণেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন বিক্রম লাহিড়ী।]

অলকা : না না না, আমি বিয়ে করবো না—আমি কাউকে বিয়ে করবো না।

[এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বিক্রম]।

বিক্রম : অনুতু।

অলকা : চম্পক আজ আসবে, না? তুমি ফোন করছিলে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি শুনেছি—বলো না—চম্পক আসবে, না?

বিক্রম : হ্যাঁ অনুতু।

অলকা : কেন ডেকে পাঠিয়েছ? এলে—তাড়িয়ে দিও—ভয় পাচ্ছো তুমি? ভয় কি? বলে দিও—বলে দিও—হবে না—এ বিয়ে হবে না—কাউকে আমি বিয়ে করবোই না—চম্পককে তাড়িয়ে দেবে তো বাবা?

বিক্রম : দেবো?

অলকা : কক্ষনো বিয়ে করবো না আমি—আমি গুরুদেবের সেবা করবো—রোজ রাতে বাগানে বসে গুরুদেবকে গান শোনাবো—গুরুদেবকে স্নান করিয়ে দেবো রোজ নতুন নতুন রান্না করে খাওয়াবো—গুরুদেবের পায়ে হাত বুলিয়ে দেবো—গুরুদেব যখন এক আশ্রম থেকে আর এক আশ্রমে যাবেন আমি তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবো, না বাবা?

বিক্রম : নিশ্চয়ই যাবে।

অজন্তা : চম্পটা বোকা জানো বাবা? ও আমায় বিয়ে করে বন্দী করতে চায়—জোর করে—জোর করে—আমায় খাঁচায় পুরতে চায়—এরকম বোকা আমি কোথ্থাও দেখিনি—চম্পকটা ভীষণ বোকা না বাবা?

বিক্রম : হ্যাঁ মা।

অজন্তা : আচ্ছা বাবা, জোর করে ও যদি তোমার কাছ থেকে আমায় ছিনিয়ে নিয়ে যায়? তোমার শঙ্কর মাছের চাবুকটা আছে না? ওটা দিয়ে মারবে তো ওকে? আমি দেখবো দূরে দাঁড়িয়ে দেখবো,—কি মজা! কি মজা!

[হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে অজন্তা। হাসি তার থামতেই চায় না। হাসতে হাসতে সে বলে চলে।]

আমায় খাঁচায় পুরতে চায়—আমায় বন্দী করতে চায়—

লোহার খাঁচা—সোনার বাটি,
কাঠের পাখি-দাঁতকপাটি।

[ছড়া শেষ করেই আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে অজন্তা।]

বিক্রম : অন্তু! অন্তু!

[হাসতে হাসতে সে ভেতরে চলে যায়। আকাশ পাতাল ভাবেন বিক্রম লাহিড়ী। এগিয়ে গিয়ে ফোনটা তোলেন। ভেতর থেকে চাবুক নিয়ে এসেছে অজন্তা। অজন্তা তার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে রেখে দেয়।]

অজন্তা : কাউকে ফোন করবে না।—এটা রেখে দাও—নাও—চম্পক এলেই আমায় ডাকবে কেমন? আমি হাততালি দেবো?

[বোবা দৃষ্টিতে বিক্রম লাহিড়ী তাকিয়ে থাকেন অজন্তার দিকে।]

আমার একটা কথাও শুনছো না বাবা? আমায় ডাকবে তো?

বিক্রম : ডাকবো।

অজন্তা : ধরো এটা।

[বিক্রম অজন্তার হাত থেকে চাবুকটা নিয়ে খুশী মনে ভেতরে চলে যায়।

কোনে হাত রাখেন বিক্রম লাহিড়ী। ভেতর থেকে শুনতে পাওয়া যায় অরুন্ধতার ছড়া।

লোহার খাঁচা—সোনার বাটি,
কাঠের পাখী—দাঁতকপাটি।

আর শোনা যায় অরুন্ধতার খিলখিল হাসির শব্দ। ফোনের ডায়াল ঘোরালেন বিক্রম লাহিড়ী।]

বিক্রম : পুট্ মি টু ডক্টর মজুমদার প্লিজ—আই সি—আই সি—থ্যাঙ্ক ইউ ভেরিমাচ্।

[আবার ফোন করেন বিক্রম লাহিড়ী অন্য নম্বরে।]

কে? মুনমুন? আমি কাকু—লাহিড়ী কাকু কথা বলছি—বাবা এসেছেন? না—না—আচ্ছা—আচ্ছা।

[অশান্ত বিক্রম লাহিড়ী ঘরময় পায়চারী করেন। ফোন বেজে ওঠে।]

এসেছেন? দাও।

[অত্যন্ত ক্লান্ত বিক্রম লাহিড়ী। ক্লান্ত কণ্ঠে কথা বলেন।]

আমি দুবার তোমাকে ফোন করেছিলাম—হ্যাঁ—হ্যাঁ—না—হ্যাঁ—উইল ইউ প্লিজ কাম ইমিডিয়েটলি—ইয়েস—ইয়েস—মোর দ্যান আর্জেনট্—আই অ্যাম ইন্ ট্রাবল্ মজুমদার—না-না-না—অনুভু—কাল সন্ধ্যে থেকে—ওর কথাবার্তা ঠিক স্বাভাবিক নয়—শক্—না হ্যাঁ—তুমি এসো—হ্যাঁ হ্যাঁ—আমি সব সময় বাড়ীতেই আছি—নো-না, প্লিজ মেক্ ইট হাফ অ্যান আওয়ার—ও. কে.—সরি টু ডিসটারব্ ইউ—থ্যাঙ্ক ইউ—থ্যাঙ্ক ইউ।

[ফোন রেখে আবার অশান্ত ভাবে ঘরময় পায়চারী করেন লাহিড়ী। পোষাক পরিবর্তন করে আশ্রমে যাবার জন্য তৈরী হয়ে এসেছে অরুন্ধতা। বিক্রম বিস্মিত।]

অরুন্ধতা : একি বাবা, তুমি এখনো ড্রেস চেন্‌জ করোনি? কতো রাত হয়েছে আশ্রমে যাবে না? তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও লক্ষীটি, প্লিজ্—গুরুদেব

আমার জন্য বসে আছেন—কারো সঙ্গে কথা বলছেন না—কারো দিকে তাকাচ্ছেন না—জানো বাবা, আজ আমি গুরুদেবকে অনেকগুলো গান গেয়ে শোনাবো—কি খুশী যে হবেন গুরুদেব, প্রিয়—তুমি তৈরী হয়ে নাও—যাও না।

[বিক্রম লাহিড়ী চেয়ারে বসে পড়েন]।

তুমি বসলে ? বসলে কেন ? ওঠো না—ওঠো না—যাবে না ?

বিক্রম : না।

অজন্তা : যাবে না। তুমি যাবে না।

বিক্রম : না।

অজন্তা : শরীর খারাপ তোমার ? আমি যাবো ?

বিক্রম : না।

অজন্তা : আমি যাবো—আমাকে যেতেই হবে—গুরুদেব আমার জন্য অপেক্ষা করেছেন—আমার গান শুনতে চাইছেন—

বিক্রম : না, তুমি যাবে না। কেউ তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন না—কেউ তোমার গান শুনতে চাইছেন না—তুমি অসুস্থ—

অজন্তা : মিথ্যে কথা ! আমি যাবো—যাবোই আমি—

[অজন্তা বাইরের দরজার দিকে এগুলে প্রায় ছুটে গিয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়ায় বিক্রম তারপর তার দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে]।

বিক্রম : না—কোথাও যাবে না তুমি।

অজন্তা : তুমি আমায় যেতে দেবে না ?

বিক্রম : না।

অজন্তা : তুমি আমায় যেতে দেবে না ?

বিক্রম : না।

অজন্তা : আমায় যেতে দেবে না তুমি ?

বিক্রম : না—না—না, ভেতরে যাও।

[নিঃশব্দে বিক্রমের দিকে তাকাতে তাকাতে পিছু হটে ভেতরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ছড়া কাটে অজন্তা।]

অজন্তা : লোহার খাঁচা, সোনার বাটি,—
কাঠের পাখি দাঁতকপাটি।

[হাসতে হাসতে ভেতরে চলে যায় অজন্তা বিক্রমকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। লাহিড়ী অশান্ত হয়ে ওঠে। বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে চম্পক রায়]।

চম্পক : কাকাবাবু!

বিক্রম : কে! চম্পক—এসো—বোসো।

[চম্পক বসে, বিক্রম লাহিড়ীও বসেন।]

চম্পক।

চম্পক : বলুন কাকাবাবু?

[ঘরে কয়েক মুহূর্তের অবাঞ্ছিত নীরবতা।]

বিক্রম : আই অ্যাম ইন্ ট্রাবল চম্পক—ফোনেই আমি তোমাকে বলতে পারতাম— কিন্তু পাছে কোন রকম মিস্আনডার স্ট্যান্ডিং গ্রো করে—তাই

চম্পক : কি হয়েছে কাকাবাবু?

বিক্রম : আই অ্যাম সরি চম্পক এক্সট্রিম্লি সরি, তোমার অনুর বিয়ে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য পোস্টপণ্ড করতেই হবে—দিস্ ইজ্—দিস্ ইজ্ মাই রিকোয়েষ্ট।

[বিক্রম লাহিড়ী চম্পকের দুটো হাত ধরে অনুনয়ের সুরে বলেন।]

চম্পক : কাকাবাবু! কি বলছেন আপনি কাকাবাবু! কার্ড ডিস্ট্রিবিউশান হয়ে গেছে—অল আদার অ্যারেনজ্‌মেনটস্ কমপ্লিট্—এখন –

বিক্রম : আই নো—আই নো চম্পক একস্‌কিউজ মি—একস্‌কিউজ মি—ইট ইজ বিয়োনড্ মাই কনট্রোল—

[কয়েক মুহূর্ত থেমে শান্ত সংযত কণ্ঠে বিক্রম লাহিড়ী বলেন।]

অনুতু ইজ নট নরম্যাল।

চম্পক : কাকাবাবু!

[চম্পকের বিশ্বাস মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে]।

বিক্রম : হ্যাঁ চম্পক, সি ইজ টু সাম্ একস্‌টেনট্‌ অ্যাবনরম্যাল—আই ডোনট্‌ নো—আই ডোনট্‌ নো হোয়াই—তোমার মাকে তুমি বুঝিয়ে বোলো চম্পক—তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে একথা বলবার সাহস আমার নেই—তিনি যেন আমাকে ভুল না বোঝেন—আফটার অল দিস্‌ ইজ্‌ অ্যান অ্যাকসিডেনট্‌। কাল বিকেল থেকেই ওর অসংলগ্ন কথাবার্তা আমি মারক্‌ করেছিলাম কিন্তু প্রথমটায় আমি বুঝতেই পারি নি, ইট ইজ সো সিরিয়াস—আজ সকাল থেকে মাঝে মাঝে ও ফিউরিয়াস হয়ে উঠছে—কি করবো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—আমার সব প্ল্যান-প্রোগ্রাম আপ্‌সেট্‌ হয়ে গেছে—ওর ফিউচার ভেবে—

চম্পক : কি বলছে ও?

বিক্রম : তোমার না শোনাই উচিত।

চম্পক : আপনি বলুন—আমি আঘাত পেলেও আপনি বলুন—বাস্তবকে স্বীকার করে আমাকে নিতেই হবে।

বিক্রম : ও তোমাকে বিয়ে করতে চায় না। ওর সব কথা, সব প্রলাপ এই একটা জিনিসকে ঘিরে—ও ভাবছে তোমাকে বিয়ে করলে ও গুরুদেবকে হারাবে—আর এই চিন্তায় ও একেবারে অ্যাবজরবড্‌ হয়ে আছে—ভাখো, তুমি এলে তোমাকে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দেবার জন্য শঙ্কর মাছের চাবুকটা ও আমার হাতে দিয়ে গেছে।

চম্পক : স্ট্রেন্‌জ!

বিক্রম : সি ইজ নট্‌ ইন হার সেনসেস্‌—ইউ শুড্‌ এক্সকিউজ হার। আমি জানি—আমি জানি চম্পক তুমি ওকে কতো ভালোবাসো—আমি জানি কতোবড়ো আঘাত তোমাকে আমি আজ দিলাম—আমিও পেয়েছি—বাট্‌ দিস ইজ ডেস্‌টিনি—উই হ্যাভ নো কনট্রোল ওভার ইট্‌।

চম্পক : আমি অজন্তার সঙ্গে কথা বলতে চাই কাকাবাবু—ওর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। কোনো ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্‌ট্ করেছেন ?

বিক্রম : হ্যাঁ, ডক্‌টর সীতেশ মজুমদারকে ডেকে পাঠিয়েছি—আধঘন্টার মধ্যেই এসে পড়বেন তিনি।

চম্পক : ডক্‌টর মজুমদার—রিনাউনড্ সাইকিয়াট্রিস্‌ট্ ?

বিক্রম : হ্যাঁ।

চম্পক : আমি তাহলে—

[চম্পক উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরে যাবার জন্য বিক্রমের অনুমতি চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই শিকারীর পোষাক পরে ভিতরের দরজায় এসে দাঁড়াতে দেখা যায় অজন্তাকে—তার হাতে রাইফেল। চম্পক স্তব্ধ হয়ে গেছে। ভয়ে-বিস্ময়ে-আতঙ্কে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলেন বিক্রম লাহিড়ী]।

বিক্রম : অন্‌তু! অন্‌তু!

অজন্তা : ঐ লোকটা—ঐ লোকটা আমাকে বিয়ে করতে এসেছে—ওকে—ওকে আমি—

[তার হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নেবার চেষ্টা করেন বিক্রম]।

বিক্রম : অনতু! অনতু! ওটা লোডেড্—দাও—দাও আমাকে—ওটা লোডেড্—অনতু!

অজন্তা : আমি জানি—সরে যাও, সরে যাও তুমি—আমি ওকে গুলি করবো।

[রাইফেল কেড়ে নিয়েছেন বিক্রম লাহিড়ী অনেক কষ্টে। রাইফেল হাতছাড়া হলে ছুটে গিয়ে চাবুকটা তুলে নিয়ে চম্পককে এলোপাথাড়ি চাবুক মারতে থাকে অজন্তা]।

বিক্রম : অন্‌তু! অন্‌তু!

অজন্তা : গেট্ আউট্—গেট্ আউট্—গেট্ আউট্।

[চম্পক দাঁড়িয়ে আছে যেন নিশ্চল পাথর।]

বিক্রম : অন্‌তু! অন্‌তু!

[অবতার দু'গালে চড় মেরে বিক্রম চাবুকটা কেড়ে নিয়ে। হঠাৎ হেসে ওঠে অবতা বিক্রমের দিকে তাকিয়ে। তারপর—চম্পকের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে ভেতরে চলে যায়]।

তুমিও কি শতদলের মতো আমাকে চারজ্ করতে চাইছো ?

চম্পক : না কাকাবাবু।

বিক্রম : থ্যাঙ্ক ইউ—থ্যাঙ্ক ইউ চম্পক—আমি জানতাম ঐ অপদার্থটার মতো আমাকে তুমি চারজ্ করবে না—আমাকে ফিল্ করবে—অবতাকে ফিল্ করবে—হৃদয় দিয়ে সবকিছু বুঝবার চেষ্টা করবে।

চম্পক : কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কাকাবাবু কেন এমন হোল—ওর মতো স্ট্রং নার্ভের মেয়ে—

বিক্রম : ছাখো চম্পক, পাওয়ার ছাখো গুরুদেবের—কতো স্ট্রং পারসোনালিটি ; তাঁর যার সংস্পর্শে এলে অনুভুর মতো স্ট্রং নারভের মেয়েও মেনটাল ব্যালেনস্ হারিয়ে ফেলে। সে আমার একমাত্র মেয়ে আমি তাকে সারিয়ে তুলবো—তোমাকে সে ভালোবাসে তোমার হাতে তাকে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হবো—জানো চম্পক, এই ঘটনায় গুরুদেবের ওপর আমার ভক্তিশ্রদ্ধা আরো অনেক বেড়ে গেছে—আজ আমার মনে হচ্ছে তিনি মহাপুরুষ—তিনি অবতার, ইয়েস—ইয়েস চম্পক—গুরুদেব—গুরুদেব—অবতার।

চম্পক : অবতার।

[মঞ্চে অন্ধকার নেমে এলো]।

॥ নয় ॥

[অন্ধকার মঞ্চ ধীরে ধীরে আলোকিত হলো। গুরুদেবের ঘর। ঘরে গুরুদেব, শুভ্রা, শ্রাবণী ও গৌতম। কোথাও বেরুবার জন্য তৈরী হয়েছেন গুরুদেব।]

গুরু : ভট্টচায এলেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।

শ্রাবণী : প্রবাল যে এখনো আসছে না গুরুদেব ? ওকি আসবে ?

[সামান্য হেসে তার কথার উত্তর দেন গুরুদেব।] —

গুরু : আসবে শ্রাবণী, নিশ্চয়ই আসবে।

শ্রাবণী : ও যে কখনো নিজে থেকে এখানে আসতে চাইবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি গুরুদেব—ওর এই পরিবর্তন—এতোবড়ো পরিবর্তন—যা অসম্ভব ছিলো—আপনি—

[বানোয়ারী এসে ঘরে ঢোকে তার হাতে দুটো বড়ো মিষ্টির প্যাকেট। প্যাকেট রেখে গুরুদেবকে প্রণাম করে বানোয়ারী।]

বানোয়ারী : গুরুদেব! গুরুদেব!

[উঠে বসে বানোয়ারী।]

অসময়ে এসে গেলাম গুরুদেব—আপনি বাইরে যাচ্ছেন কোথাও ?

শ্রাবণী : হ্যাঁ, থিওজফির ওপর গুরুদেব আজ আলোচনা করবেন।

বানোয়ারী : থিওজফি!

শ্রাবণী : হ্যাঁ।

বানোয়ারী : সিভো শুনেছি বিরাট ভারী বেপার—জ্ঞানের বেপার আছে না ?

গুরু : অথচ ত্যাখো তার কিছুই জানিনা আমি—আমি চলেছি বক্তৃতা দিতে।

বানোয়ারী : আরে রাম রাম গুরুদেব— ই সব আপনি কি বোলছেন ? আপনি জানেন না তো কে জানে ? সোবাই তো বোলে আপনার মতো জ্ঞানী আদমী সারা দেশে আর একজনও না আছে—লেকিন গুরুদেব—

গুরু : বলো ?

বানোয়ারী : থিওজফি কি আছে ?

গুরু : প্রেততত্ত্ব।

বানোয়ারী : ভূত পিরেত ?

গুরু : কিছুটা তাই বটে।

বানোয়ারী : ইর উপরে আপনি লেক্‌চার দিবেন !

গুরু : তাইতো ধরেছে—একটু আধটু ঘাঁটাঘাঁটিও করেছি—না আর বলি কি করে বলো ?

[ঘরে একটা অবাঞ্ছিত নীরবতা। বানোয়ারী যেন কিছু বলতে চায়। গুরুদেব সেটা বুঝতে পেরে তাকে জিজ্ঞেস করেন] কিছু বলবে তুমি ?

বানোয়ারী : হাঁ গুরুদেব।

গুরু : বলো ?

বানোয়ারী : গো-মাতাকে রক্ষা করবার জন্য আমরা একটা হোমযজ্ঞ করবো আপনি যদি দয়া করে—

গুরু : কি করতে হবে আমাকে !

বানোয়ারী : আমাদের সোভাপতি হোতে হোবে—যজ্ঞের দিন সকলের পহলে যজ্ঞে ঘি ঢালতে হোবে—দয়া করে—

গুরু : সে যে ভস্মে ঘি ঢালা হবে আগরওয়াল—একাজে আমাকে তুমি বাদ দাও—অন্য কাউকে ধরো—অনেক লোক আছে।

বানোয়ারী : না-না-না গুরুদেব, ইযে আমি শুনবো না—আপনার মতো কে আছে ? আমার মহল্লার সোবাইকে বোলেছি আপনি আসবেন—আমাদের সোভাপতি হবেন—সোবাই ধন্য হোয়ে গেছে।

গুরু : আমার হয়ে কথা দেওয়া তোমার উচিত হয়নি—অন্যায় করেছো।

বানোয়ারী : অন্যায়।

গুরু : হ্যাঁ। করছো করো, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু এ কাজে আমার সমর্থন আছে কি নেই আগে তোমার জেনে নেওয়া উচিত ছিলো।

[বানোয়ারী গুরুদেবের কথায় অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়। সে গুরুদেবকে বুঝেই উঠতে পারে না]

বানোয়ারী : আমাদের এ কাজ আপনি সমর্থন কোরেন না।

গুরু : না।

বানোয়ারী : কিন্তু—

গুরু : দেখো আগরওয়াল, যেদেশের কোটি কোটি লোক দু'বেলা পেটভরে খেতে পারছে না, পরবার কাপড় পাচ্ছে না, থাকবার জায়গা পাচ্ছে না, যে দেশের শতকরা সত্তরজন এখনো নিরক্ষর—তাদের খাদ্যবস্ত্র বাসস্থান শিক্ষার জন্য খরচা না করে গো-রক্ষা গো-রক্ষা করে চেঁচালে কি হবে—নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করে লাভ কি—কেউ করে কখনো?

বানোয়ারী : কিন্তু গুরুদেব—ধ্বংসের হাত থেকে গো-মাতাকে রক্ষা কোরা আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

গুরু : কর্তব্য পালনের আগে নিজেরাই যে ধ্বংস হয়ে যাবে—দেশ শুদ্ধ লোকে শ্মশানে গেলে গো-মাতাকে রক্ষা করবেটা কে বলো? আগে মানুষ বাঁচুক—হাসুক—দীর্ঘজীবী হোক—শিক্ষিত হোক—নিজের দিকে নজর দিক—পশুপাখী জন্তুজানোয়ারের ওপর অতো নজর না দিলেও চলবে।

বানোয়ারী : কিন্তু গুরুদেব আমাদের ধর্ম—

গুরু : গো-মাতাকে রক্ষা করবার জন্য চার হাত পায়ে লাফাবার নির্দেশ যদি তোমাদের ধর্ম দিয়ে থাকে, তাহলে সে ধর্ম আমার জন্য নয় আগরওয়াল—আমি বিধর্মী। একজন বিধর্মীকে নিয়ে গিয়ে

তোমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবার কথা চিন্তাই কোরো না—সেটা উচিতও হবে না। আমি বুঝতে পারছি আগরওয়াল, তুমি আঘাত পাচ্ছো—আমি কিন্তু তোমার বিশ্বাসে আঘাত দিতে চাই না—তুমি স্বাধীন তোমার চিন্তাশক্তি রয়েছে—তোমার ইচ্ছে মতো কাজ তুমি করবে আমার বাধা দেবার অধিকার সেখানে নেই—আমার কথা হচ্ছে—আমার অনুরোধে আমাকে তুমি এর মধ্যে টেনে এনো না। গো-মাতার ওপর কিছু বলতে বললে হয়তো বলতে পারবো কিন্তু তাকে বাঁচাবার জন্য কাঠে আগুন জ্বেলে বসে তাতে ঘি ঢালতে আমি পারবো না—সেরকম কোন উদ্ভট আন্দোলনে যোগও দিতে পারবো না।

বানোয়ারী : আমি যে সোবাইকে বলে দিয়েছি গুরুদেব।

গুরু : কি হয়েছে তাতে? গিয়ে তাদের সত্যিকথাই বোলো—আমার আপত্তি আছে।

[প্রবাল এসে বাইরের দরজায় দাঁড়িয়েছে। ক্রিম্ কালারের স্যুট্ পরে এসেছে প্রবাল। তাকে দেখে শ্রাবণী খুব খুশী।]

দুঃখ পেও না—আমার মতামত তোমাকে খুলেই বললাম।

বানোয়ারী : আমরা কি তবে ভুল কোরছি গুরুদেব? যা কোরে আসছি সব ভুল? যা কোরে চলেছি সেকি পাগলামো? আপনে বলুন গুরুদেব?

গুরু : এই তো মুসকিলে ফেললে? এ মুসকিলের আসান করা যে ভারী শক্ত আগরওয়াল—এ যে পুরোপুরি বিশ্বাসের ব্যাপার—আমার বিশ্বাস আমার কাছে—তোমার বিশ্বাস তোমার কাছে।

বানোয়ারী : লেকিন গুরুদেব আমি আপনাকে জানি—আপনাকে বিশোয়াস করি—আমি কি করবো আমাকে বোলে দিন—আমাদের যজ্ঞে পচাশ হাজার টাকা খরচা হচ্ছে—এ টাকা—

গুরু : বলো কি! পঞ্চাশ হাজার টাকায় যে একটা স্কুল হয়ে যায়—পঞ্চাশটা

রিফিউজির টিনের চালা হয়ে যায়—একটা প্রসূতি সদনের ব্লক হয়ে যায়—
আমি চিন্তাই করতে পারছি না আগরওয়াল—

[অশান্ত হয়ে উঠেছে বানোয়ারী। গুরুদেব তার বিশ্বাসে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছেন। একটা তীব্র আলোড়ন চলেছে তার মনের মধ্যে। অশান্ত গলায় সে বলে ওঠে]।

বানোয়ারী : আমি বুঝেছি—আমি বুঝেছি গুরুদেব—আমি যাচ্ছি—যজ্ঞের সিক্রেটারী আমি, আমি রেজিগনেশান দিবো পুরা টাকা রিলিফ ফানডে পাঠিয়ে দিবো—আমি যাচ্ছি গুরুদেব—আমি শান্তি পাচ্ছি না।

গুরু : আগরওয়ালা।

[গুরুদেবকে প্রণাম করে দ্রুতই ঘর ছেড়ে চলে যায় বানোয়ারী। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসেন গুরুদেব।]

বিকার শ্রাবণী—বিকার। সমাজের প্রত্যেক স্তরে বিকৃতি—এই যে তোমরা আমার কাছে আসো এও এক ধরনের বিকৃতি—আমিও বিকারগ্রস্ত—আমরা সবাই বিকারগ্রস্ত—জানিনা, গোটা পৃথিবীর লোকে কবে সুস্থ হবে। আপনি বসুন—ওসব পরে—বসতে একটু অসুবিধেই হবে।

[স্যুট পরে একটু কষ্ট করেই সতরঞ্চে বসলেন প্রবাল গুপ্ত।]

প্রবাল : আপনার আশ্রমটা কোথায়? [রশ্মি এসে ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়েছে।]

গুরু : আশ্রম কোথায়? আশ্রম কি কেউ আজ গড়তে পারে নাকি? গড়লেও সেটা আশ্রম হবে না—হবে, ধর্মশালা।

প্রবাল : শ্রাবণী বলছিলো, ভারতের—বড়ো বড়ো শহরে আপনি অনেকগুলো আশ্রম তৈরী করবেন?

গুরু : আশ্রম ঠিক নয়—সেই ধাঁচের বলতে পারেন—লোকাচর স্কুল থাকবে সবগুলোতে আমার এখানে যাঁরা আসেন তাঁরাই ঠিক করেছেন—আমারও আপত্তি নেই— তবে সে হতে এখনো অনেক দেরী আছে—বছর

পাঁচেকের আগে তো নয়ই—অর্থ হয়তো জুটবে কিন্তু মানুষের মতো মানুষ যে জুটছে না। খাঁটি মানুষ—শিক্ষিত মানুষ—ইস্পাতের মতো জনকয়েক মানুষ না পেলে ওকাজে হাত দেওয়াই হয়তো সম্ভব—হয়ে উঠবে না—মানুষের মতো মানুষের এমন দুর্ভিক্ষ—পৃথিবীর আর কোনো দেশে বোধ হয় নেই।

প্রবাল : আপনার এখানে যারা আসেন সবাই তো আপনার শিষ্য ?

গুরু : না-না, আমার এখানে এলেই আমার শিষ্য হতে হবে এমন কোন কথা নেই—গৌতমের দুচারজন বন্ধু আসে, তারা আমার শিষ্য নয়'——আমার অতীতের কয়েকজন বন্ধু এখনো আমার কাছে আসেন, তারাও আমার শিষ্য নয়—অনেকে আবার মাঝে মধ্যে আমাকে যাচাই করে দেখতে আসেন, তারা আমার শিষ্য নয়—দরজা খোলাই যাকে যার ইচ্ছে আসতে পারেন—এই যে আজ আপনি এসেছেন আপনি শিষ্য নন ?

[সামান্য হাসেন গুরুদেব। লজ্জিত হয় প্রবাল সেই সঙ্গে শ্রাবণী। ভট্টাচার্য এসে দুজনকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচালেন। গুরুদেবকে প্রণাম করে সঞ্জীব বলে।]

সঞ্জীব : অনেক দেরী হয়ে গেলো গুরুদেব।

গুরু : হ্যাঁ, আমি তৈরী হয়েই আছি।

সঞ্জীব : আসুন।

গুরু : চলো।

[গৌতম ও রশ্মি বাদে ঘরের সবাই চলে যায়। গৌতম বসেই আছে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে রশ্মি। তারপর এগিয়ে এসে আঙুল দিয়ে তাকে নাড়া দেয়।]

রশ্মি : অ্যাই—অ্যাই।

গৌতম : অ্যাঁ।

রশ্মি : তুমি গেলে না ?

গৌতম : কোথায় ?

রশ্মি : ভূতপ্রেতের রাজত্বে—গুরুদেবের লেকচার শুনতে ?

গৌতম : না।

রশ্মি : আমি—না, জানো, একবার গুরুদেবের আলমারী থেকে একটা বই নিয়ে পড়েছিলাম—কি ভয় করতে আরম্ভ করলো—তিন চারদিন আর ঘুম আসতেই চায় না—শুলেই মনে হতো ঘরে কারা যেন সব সময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—চোখ বুজলেই ঘাড় মটকাবে—তুমি কি ধ্যানে বসলে নাকি—অ্যাঁ। আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে যাবো ?

গৌতম : না।

রশ্মি : যাক্ বাঁচলাম—জেগে জেগেই ধ্যান করছো তাহলে ? কি ভাবছো গো এতো—আচ্ছা, সব সময় তোমার পাশে পাশে থাকতে ইচ্ছে করে কেন আমার বলতো ? ইচ্ছে করে তোমার চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে শুধু বসে থাকি।

[গৌতম তার দিকে তাকিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রশ্মি বলে।]

আমি এ আশ্রম ছেড়ে চলে যাবো।

[গৌতম বিস্মিত,]

এখানে আর থাকবো না আমি।

গৌতম : কেন !

রশ্মি : এখানে দয়া নেই—মায়া নেই—প্রেম-ভালোবাসা বলে কিছু নেই—সবাই এখানে কাঠের পুতুল—সবাই যন্ত্র।

গৌতম : সবাই যন্ত্র—সবাই এখানে কাঠের পুতুল—কি বলছো তুমি।

রশ্মি : আমার মনের কথা বলছি। এখান থেকে চলে .যাবো—কাউকে বলিনি—অনেক দিন ধরেই ভাবছি—আজ তোমায় বললাম—একেবারে ঠিক করে ফেলেছি—আর পারছি না—কেউ দম দিয়ে আমায় চালাবে

আমি চাই না—আমি নিজের খুশীমতো চলতে ফিরতে বাঁচতে চাই—আমায় যেতেই হবে।

গৌতম : এ আশ্রম ছেড়ে চলে যাবে তুমি।

রশ্মি : হ্যাঁ।

গৌতম : কোথায় যাবে ?

রশ্মি : যেদিকে দুচোখ যায়। এতোবড়ো পৃথিবীতে আমার মতো একটা সাধারণ মেয়ের একটুখানি জায়গা নিশ্চয়ই হবে—কারো মনের ভেতরে বসবার ক্ষমতা আমার নেই বলে কি ভাবো ফুটপাথে গিয়ে বসতেও আমি পারবো না ?

গৌতম : আশ্রম থেকে ফুটপাথ তোমার ভালো লাগে ?

রশ্মি : লাগেই তো—সেখানে প্রাণ আছে—আলো আছে—বাতাস আছে।

গৌতম : আলো বাতাস প্রাণ এখানে নেই ?

রশ্মি : নেই—নেই—নেই এখানে সবাই মুনি ঋষি মহাপুরুষ - সবাই এখানে ভগবান হবার তালিম নিচ্ছে।

গৌতম : রশ্মি।

[গৌতমের কাছে সরে এলো রশ্মি। শান্ত সংযত গলায় সে বলে]।

রশ্মি : আমি এখান থেকে চলে গেলে তোমার একটুও কষ্ট হবে না ? আমার কথা তুমি একটিবারের জন্যও মনে আনবে না ?

[গৌতম নিরুত্তর। }

তুমি বেঁচে যাবে, না ? আর কেউ তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না ?

গৌতম : এসব অবাস্তব কথা কেন তুলছো ?

রশ্মি : অবাস্তব কেন ?

গৌতম : যা সম্ভব নয় তাই নিয়ে বোকারা মাথা ঘামায়।

রশ্মি : তুমিতো জানোই আমি বোকা—বোকাই থাকতে চাই, আমি চালাক হতে চাই না—ভগবান হতে চাই না—আমি মেয়ে, মেয়ে হয়ে জন্মেছি—

মেয়ে হয়েই মরতে চাই—পৃথিবীর সবকিছুকে আমি ভালোবাসি—সবকিছুকে জড়িয়ে ধরতে চাই।

গৌতম : এখানে থেকে বুঝি সেটা সম্ভব নয়?

রশ্মি : না—না—না। আমি বোকা—তার তুমি কি জানো? অন্ধ—অন্ধ তুমি, কি করে বোঝাবো তোমায়—আমি কি চাই।

গৌতম : কি চাও?

রশ্মি : কতোবার বলবো—কেমন করে বলবো—কাকে বলবো?

গৌতম : বলো আর একবার শুনি?

রশ্মি : তোমাকে—তোমাকে—তোমাকে—তোমাকে চাই আমি।

[গৌতম কেঁপে ওঠে। রশ্মি মরীয়া হয়ে উঠেছে]।

গৌতম : আ—মা—কে।

রশ্মি : হ্যাঁ—হ্যাঁ—তোমাকে। তোমাকে জড়িয়ে ধরতে চাই—তোমাকে ভালোবাসতে চাই—তোমার স্ত্রী হতে চাই।

[উদ্‌ভ্রান্ত গৌতম উঠে দাঁড়িয়েছে]।

গৌতম : রশ্মি! রশ্মি! তুমি পাগল হয়ে গেছো—পাগল হয়ে গেছো তুমি—ভুল বকছো?

রশ্মি : হ্যাঁ আমি ভুল বকছি—আমি পাগল হয়ে গেছি—আর কে আমাকে পাগল করেছে জানো? তুমি।

গৌতম : আমি! [গৌতমের স্বর কাঁপছে, শরীর কাঁপছে।]

রশ্মি : হ্যাঁ, তুমি। আমি জ্বলছি, পারো তুমি আমায় শান্ত করতে? আমি শুকনো নীরস—পারো তুমি আমায় সজীব করতে? আমার খিদে মেটাতে? আমি মেয়ে—মা হতে চাই—পারো তুমি আমায় সাহায্য করতে? [উত্তেজিতা রশ্মি বিভ্রান্ত গৌতমের দুহাত ধরে জিজ্ঞেস করে উত্তেজিত গলায়।] বোবা বনলে চলবে না? জবাব দাও, জবাব চাই

তোমায়? আঘাত দিতে চাও—তাই দাও—আঘাতের চিহ্ন নিয়েই এ আশ্রম ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাবো আমি।

(ধরাগলায় কথা বলে রশ্মি)

গৌতম : রশ্মি! রশ্মি! এসব—এসব কি বলছো তুমি?

রশ্মি : আমার প্রশ্নের জবাব দেবে না?

গৌতম : আমি—আমি—

রশ্মি : আমার চোখ ছুটোর দিকে তাকিয়ে বলো তো গৌতম, আমায় ভালোবাসা যায় কিনা?

গৌতম : অ্যাঁ! অ্যাঁ! অ্যাঁ!

রশ্মি : শুধু বলো, আমায় ভালোবাসা যায় কি না? আমি চলে যাবো—ঠিক চলে যাবো। শুধু একবার বলো আমায় ভালোবাসা যায় কি না?

[যন্ত্রচালিতের মতো তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে গৌতম]।

গৌতম : যায়।

রশ্মি : আঃ। গৌতম আমি সুখী—আমার চেয়ে সুখী পৃথিবীতে আজ আর কেউ নয়—এতো সুখ—ওঃ! আমি এখন মরতেও পারি।

[আস্তে আস্তে বাইরের দরজার দিকে এগোয় রশ্মি]।

গৌতম : কোথায় যাচ্ছো?

রশ্মি : আশ্রম ছেড়ে।

গৌতম : না। [বিস্মিতা রশ্মি ফিরে তাকায়। তার পা আটকে গেছে]।

রশ্মি : এখানে আমি আর থাকতে পারবো না গৌতম।

[পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে গৌতমের চোখে চোখ রেখে রশ্মি বলে]। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

গৌতম : আমি!

রশ্মি : হ্যাঁ।

গৌতম : কোথায়?

রশ্মি : অনেক—অনেক দূরে পালিয়ে যাবো আমরা, ঝঁ্যাপা দিয়ে বসে বসে সেখানে কেউ আমাদের ভগবান বানাতে পারবে না—আমরা স্বাধীন হবো—মুক্ত হবো—আমরা ঘর বাঁধবো—সুখী হবো—স্বর্গ গড়বো।

গৌতম : কিন্তু আশ্রম—

রশ্মি : আশ্রম কোথায়? এতো ফ্যাক্টরী—গুরুদেবের এ ফ্যাক্টরীর কাঁচা লোহার পাত হতে চাই না আমি—তুমিও হয়ো না—আমাদের পুড়িয়ে পিটিয়ে খেয়াল-খুশীমতো যা ইচ্ছে তাই করতে তাঁকে দেবো কেন? আমরা পালিয়ে যাবো তাঁর নাগালের বাইরে অনেক দূরে।

গৌতম : কিন্তু গুরুদেব—

রশ্মি : কে গুরুদেব? কার গুরুদেব? কি সম্পর্ক তোমার-আমার, তাঁর সঙ্গে? সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে সে তোমাকে করেছে যন্ত্র—আমাকে করেছে বোকা—সে আমাদের শত্রু।

গৌতম : আমি—আমার—

রশ্মি : তোমার দেহে মনে মরচে ধরিয়ে দিয়েছে গুরুদেব—শুধু ধারালো মাথা দিয়ে পৃথিবীর কতোটুকু উন্নতি তুমি করবে বলো?

[রশ্মি গৌতমের ঘনিষ্ঠ হয়েছে তার বুকে হাত রেখেছে।]

গৌতম : রশ্মি—রশ্মি তুমি সরে যাও রশ্মি—

রশ্মি : কেন?

গৌতম : আমি পুরুষ—আমি পুরুষ—তুমি নারী—

রশ্মি : কি হয়েছে তাতে?

গৌতম : তোমার গায়ের গন্ধ আমাকে উত্তেজিত করছে—তোমার হাতের স্পর্শ আমাকে উত্তেজিত করছে—তোমার চোখ আমাকে উত্তেজিত করছে—পাপ—পাপ—রশ্মি—আমার পাপ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—তুমি সরে যাও—আমি পাপী হচ্ছি—আমি ভুলতে পারছি না আমি পুরুষ—তুমি সরে যাও—পাপের আগুন আমাকে ঘিরে ধরছে। সরে যাও—সরে যাও।

রশ্মি : পাপ কি? পাপী কে?

গৌতম : জানি না—আমি জানি না—তুমি সরে যাও—আমার রক্ত ফুটছে—আমার মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে যাচ্ছে—আমার ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে উঠছে—আমি ক্ষিপ্ত—আমি পুরুষ।

রশ্মি : তুমি কাপুরুষ!

[রশ্মির কথায় ক্ষিপ্ত গৌতম চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানায়।]

গৌতম : না। তোমার দেহ—তোমার দেহ—

রশ্মি : তোমার।

[রশ্মি গৌতমকে জড়িয়ে ধরেছে। গৌতমের আচরণ ঠিক স্বাভাবিক নয়।]

গৌতম : রশ্মি! রশ্মি! গুরুদেব—খোলা দরজা দিয়ে আমি নরকে ঢুকছি—আমি—আমি—

[হঠাৎ এক অদ্ভুত পরিবর্তন গৌতমকে অস্বাভাবিক শান্ত করে দেয়। শান্ত-সংযত কণ্ঠে রশ্মির চোখে চোখ রেখে সে বলে।]

ভুল ভুল বলেছি আমি রশ্মি—বিষ নয়—আমি অমৃতের খোঁজ পেয়েছি—নরক নয়—স্বর্গে যাবার রাস্তাও আমি খুঁজে পেয়েছি—আমি প্রতিজ্ঞা করছি রশ্মি—আমি তোমাকে ভালো বাসবো আমি তোমাকে সুখী করবো—আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

রশ্মি : গৌতম! গৌতম! আর বোলো না গৌতম—আমার ভয় করছে।

[গৌতম এবার জড়িয়ে ধরেছে রশ্মিকে। বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন গুরুদেব ও শুভ্রা। ঐ দৃশ্য দেখে দুজনেই বিস্মিত-স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। রশ্মি ভয়ে কাঁপছে। গৌতমের কিন্তু কোন রকম ভাবান্তর নেই। শান্ত সংযত।]

গুরু : গৌতম! এটা পবিত্র আশ্রম—নরক নয়।

গৌতম : এটা নরক নয় গুরুদেব—আশ্রমও নয়।

গুরু : কি এটা!

গৌতম : স্বর্গ।

গুরু : কার স্বর্গ! কে গড়েছে স্বর্গ এখানে?

গৌতম : আমি—রশ্মি।

গুরু : তুমি – রশ্মি।

গৌতম : হাঁ। আমি রশ্মিকে বিয়ে করবো।

[গুরুদেব শুভ্রা দুজনেই চমকে ওঠে গৌতমের কথায়।]

শুভ্রা : কি বলছিস তুই গৌতম! কি বলছিস।

গৌতম : আমি রশ্মিকে বিয়ে করবো।

গুরু : গৌতম।

গৌতম : আপনার আপত্তি থাকলে আশ্রম ছেড়ে বাইরে কোথাও গিয়ে আমরা থাকবো।

শুভ্রা : গৌতম তুমি সন্ন্যাসী।

গৌতম : ভণ্ড সন্ন্যাসী হয়ে প্রতিমুহূর্তে বিবেকের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার চেয়ে সংসারী হয়ে রোজকার জ্বালাযন্ত্রণার দুঃখের মধ্যে - সুখের স্বাদ নেওয়া অনেক ভালো।

গুরু : কি বললে! কি বললে তুমি। শুভ্র! শুভ্রা! আমার পা কাঁপছে — একটা জমাট অন্ধকার আমাকে ঘিরে ধরছে—একটা বিষাক্ত ধোঁয়া আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে—ওদের এঘর ছেড়ে চলে যেতে বল—আমি ওদের সহ্য করতে পারছি না।

[গুরুদেব অশান্ত হয়ে উঠেছেন। নিঃশব্দে ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে ভেতরে চলে যায় গৌতম-রশ্মি। গুরুদেব চৌকিতে বসেন। শুভ্রা নির্বাক। কথা বলবার ভাষা সে হারিয়ে ফেলেছে। কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়। বাইরে থেকে ছুটে এসে গুরুদেবের পা জড়িয়ে ধরে অজন্তা। আর একবার চমকে ওঠেন গুরুদেব সেই সঙ্গে চমকে ওঠে শুভ্রা]

অজন্তা : গুরুদেব—গুরুদেব—ওরা আসছে—ওরা আমায় মেরে ফেলবে—

গুরুদেব ওরা আমায় খাঁচায় পুরতে চায়—আমি যাবো না—আমি কিছুতেই যাবো না গুরুদেব।

[হঠাৎ যটা এই ঘটনায় গুরুদেব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। বিস্মিত চোখে তিনি দেখেন বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বিক্রম লাহিড়ী ও চম্পক রায়।]

ঐ দেখুন গুরুদেব—ওরা এসেছে—আমায় নিয়ে যেতে এসেছে—আমি যাবো না—এখানে থেকে কোথ্থাও যাবো না।

[গুরুদেবের দু'পা জড়িয়ে ধরে আছে অজন্তা।]

বিক্রম : গুরুদেব, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে গুরুদেব—আগামী শুক্রবার ওর বিয়ের সব বন্দোবস্ত করেছি—কি অবস্থা ওর দেখুন—মেণ্টাল ব্যালেন্স ও একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে, কি করবো আমি, আমাকে আপনি বলে দিন ?

অজন্তা : ওকে তাড়িয়ে দিন—ওকে তাড়িয়ে দিন গুরুদেব—আমার পেছনে ও গাড়ী নিয়ে তাড়া করে এসেছে ও আমায় আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেবে।

বিক্রম : গুরুদেব :

গুরু : যাও অজন্তা, ওরা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন—ওদের সঙ্গে যাও।

[অজন্তার মাথায় হাত রেখে আদর করে গুরুদেব বলেন। গুরুদেবের গলার স্বর আজ অস্বাভাবিক রকমের শান্ত।]

অজন্তা : ওরা যে আমায় মেরে ফেলবে।

গুরু : কে বলেছে ?

অজন্তা : আমি জানি। ঐ লোকটা—ঐ লোকটা আমার গলা টিপে মেরে ফেলবে—ওর চোখ দুটো দেখুন ?

গুরু : কি দেখছো তুমি ওর চোখে ?

অজন্তা : আগুন।

গুরু : না অজন্তা, ওর চোখে বিভ্রান্তি, ওর চোখে অভিমান, ওর চোখে ভালোবাসার ঢেউ—ও তোমার বন্ধু, ও তোমার সঙ্গী, ও তোমার আত্মীয়, ও তোমার স্বামী—ওর সঙ্গে যাও—ও তোমাকে ভালবাসে, গভীর ভাবে ভালোবাসে।

[গুরুদেবের কথায় অপলক দৃষ্টিতে চম্পকের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে অজন্তা। গুরুদেবের কণ্ঠস্বর ঘরে এক অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি করে।]

যাও ওর সঙ্গে—ও তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে—যাও।

[অজন্তা একটু একটু করে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে, শান্ত হয়ে যায়]

নিয়ে যাও ওকে—হাত ধরে।

[চম্পক এগিয়ে এসে অজন্তার হাত ধরে। অজন্তা যন্ত্র চালিতের মতো চম্পকের সঙ্গে বাইরে চলে যায়। গুরুদেব বিক্রম লাহিড়ীকে ডাকেন।]

লাহিড়ী।

বিক্রম : গুরুদেব।

গুরু : বড়ো ডাক্তার দেখিয়ে আগে ওকে সারিয়ে তুলবে তারপর বিয়ে দেবে—আমার এখানে আসবার আর দরকার নেই—আমি আজ থেকে তোমার কাছে, অজন্তার কাছে, চম্পকের কাছে মৃত।

বিক্রম : গুরুদেব।

গুরু : এ পারের ঘর না গুছিয়ে ওপারের ঘর গোছাতে গেলে সে এ পারের-ওপারের সব কিছুই হারাবে লাহিড়ী।

বিক্রম : গুরুদেব। এতো নিষ্ঠুর আপনি গুরুদেব।

গুরু : এ নিষ্ঠুরতা নয় লাহিড়ী, এ প্রয়োজন। যাও, ওরা এগিয়ে গেছে—আমি অত্যন্ত ক্লান্ত—কথা বলার শক্তিও আমি আজ হারিয়ে ফেলেছি।

[গুরুদেবকে প্রণাম করে বিক্রম চলে যায়।]

বিশ্রাম—শুভ্রা, বিশ্রাম করতে না পেলে আমিও বোধহয় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবো। যারা আমাকে জোর করে এই গুরুর আসনে

বসিয়েছে তারা জানে না—তারা জানে না শুভ্রা—আমিও মানুষ—রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ।

[শঙ্কর এসে দাঁড়িয়েছে বাইরের দরজায়। তার দিকে একবার তাকিয়ে ভেতরে চলে যান গুরুদেব। শঙ্কর বিস্মিত]।

শঙ্কর : ব্যাপারখানা কি বলো তো ?

শুভ্রা : কি ?

[শুভ্রার গলার স্বরে ঝাঁজ রয়েছে।]

শঙ্কর : ভোলানাথের তিন চোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বেরুলো বলে মনে হোলো।

শুভ্রা : তুমি—তুমি, সবকিছুর জন্ত তুমিই তো দায়ী।

[শুভ্রা কেঁদে ফেলে - শঙ্কর হক্‌চকিয়ে যায়।]

শঙ্কর : মেয়ে জাতটা আচ্ছা ধাতুতে তৈরী দেখছি—এই ফোঁস করে উঠলো এই আবার তার ফোঁসফোঁসানি—কি হয়েছে বলো ?

শুভ্রা : কি আবার হবে ; সর্বনাশ হয়েছে।

শঙ্কর : আরে, সর্বনাশ তো প্রতিমুহূর্তে কতো লোকেরই হচ্ছে, সর্বনাশটা হোলো কার ?

শুভ্রা : তোমার—আমার—গুরুদেবের।

শঙ্কর : তোমার বা গুরুদেবের হতে পারে, কিন্তু আমার কোনরকম সর্বনাশ হয়েছে বলে তো আমার মনে হচ্ছে না। একটু বুঝিয়ে বলবে।

শুভ্রা : হয়েছে।

শঙ্কর : কি হয়েছে সেইটাই তো জানতে চাইছি—দয়া করে বলো ?

শুভ্রা : গৌতম রশ্মিকে বিয়ে করবে—সে আশ্রম ছেড়ে চলে যাবে।

শঙ্কর : এতো চমৎকার কথা এতে সর্বনাশের কি হলো ? একটা ছেলে একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে—দুজনেরই বয়েস হয়েছে—বিয়ে দিয়ে দাও—

ঝামেলা চুকে যাক—একদিন ভালো মন্দ কিছু খাওয়া যাক্—খাওয়ানোও যাক্ দু'চার পয়সা খরচ করে।

[দুহাত দিয়ে শুভ্রা তার জামা চেপে ধরেছে ঠেলা দিয়ে]।

শুভ্রা : দূর হও—দূর হও তুমি—তোমার মতো অপদার্থের রক্ত যার দেহে সে মহৎ হবে কি করে—তাকেও সেই অপদার্থই হতে হবে।

[শুভ্রার কথায় হাসতে শুরু করে শঙ্কর। হাসি আর তার থামতেই চায় না। মঞ্চ অন্ধকার হয়]।

॥ দশ ॥

[মঞ্চের আলো একটু করে প্রস্ফুটিত হয়। সবাই রয়েছে আজ গুরুদেবের ঘরে। শ্রাবণী, প্রবাল, চৈতন্য, মহেন্দ্র, সুব্রত, বানোয়ারী, অমূল্য, অমিয়, রতীন, নির্মল ও সঞ্জীব। উদগ্রীব হয়ে সবাই তারা অপেক্ষা করছে গুরুদেবের জন্য। নিজেদের মধ্যে খুবই আস্তে আস্তে নিজের নিজের কথা বলে চলেছে তারা অর্থাৎ একটা চাপা গুঞ্জনের ঢেউ যেন আজ আশ্রমের এই ঘরখানায়। রশ্মি এসে ঘরে ঢুকে বসে];

মহেন্দ্র : আসছেন? গুরুদেব আসছেন?

রশ্মি : উনি পড়বার ঘর থেকে বেরিয়ে ঠাকুর ঘরে গেলেন—আসছেন।

[আবার সেই চাপা গুঞ্জন। এবার অনেকটা আস্তে। গৌতম এসে ঘরে ঢুকলো।]

সুব্রত : গুরুদেব আসছেন?

গৌতম : হ্যাঁ, উনি ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে এলেন—এক্ষুনি এসে পড়বেন।

[গৌতম বসলো। গুঞ্জন একেবারেই থেমে গেলো। শুরু হোলো 'গুরুদেব' সঙ্গীতে। সেই সঙ্গীত প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে, তারপর যখন বেশ উঁচুতে উঠেছে ভেতরে তখন অশান্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠেন গুরুদেব।]

গুরুদেব : বন্ধ করো—বন্ধ করো—সঙ্গীত বন্ধ করে দাও।

[শুভ্রা দ্রুত এসে ঘরে ঢোকে।]

শুভ্রা : বন্ধ করুন—সঙ্গীত বন্ধ করুন—গুরুদেব অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

[মুহূর্তে সঙ্গীত থেমে যায়। সকলের মুখ দিয়ে একটি মাত্র বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে আসে।]

সকলে : গুরুদেব!

শুভ্রা : আজ ওঁর পক্ষে এখানে এসে বসা আর সম্ভব হবে না—উনি অত্যন্ত অসুস্থ—আপনি একবার ভেতরে আসুন।

[ডাক্তার ব্রতীন ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে শুভ্রা ভেতরে চলে যায়। আবার একটা চাপা গুঞ্জন ওঠে। এবার আর নিজের নিজের কথা নিয়ে নয় এবারের আলোচ্য বিষয় গুরুদেব। ব্রতীন ঘোষ ফিরে আসেন। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর। তাকে সবাই ঘিরে ধরেছে।]

মহেন্দ্র : কি হয়েছে—কি হয়েছে গুরুদেবের ?

সুব্রত : কেমন দেখলেন ?

বানোয়ারী : কেমন আছেন ?

ব্রতীন : ওঁকে দেখবার সুযোগ পাইনি—ঘরের সব দরজা জানালা উনি বন্ধ করে দিয়েছেন।

অমিয় : দরজা জানালা সব বন্ধ।

অমূল্য : আশ্চর্য!

[ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে শুভ্রা।]

শুভ্রা: হ্যাঁ, উনি সমাধিস্থ হয়েছেন—বোধহয় আজ সারারাত দরজা খুলবেন না।

সঞ্জীব: অদ্ভুত! অদ্ভুত!

অমূল্য: আশ্চর্য! আশ্চর্য!

[আবার একটা চাপা গুঞ্জন আস্তে আস্তে উঁচুতে ওঠে। ধীরে ধীরে মঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে।]

॥ এগারো ॥

[অন্ধকার মঞ্চ সামান্য লাল আলোয় আলোকিত। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝেমাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—বাজ পড়ছে। এক গুরুদেব কালো চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে শুয়ে আছেন খাটে, আর একজন বসে আছেন সেই খাটে। একই গুরুদেবের দুই সত্তা। যিনি শুয়ে আছেন তিনি বর্তমানের গুরুদেব আনন্দ গোস্বামী—যিনি বসে আছেন তিনি আজ থেকে সাতাশ বছর আগেকার—দেবব্রত গোস্বামী। বিকট শব্দ করে দরজা জানলা গুলো খুলে গেল। ধীরে ধীরে সৃষ্টি হোলো এক অবাস্তব পরিবেশের। ঘরের আলো আরো কিছুটা কমে যায়। অদ্ভুত একটা বাজনার সুর বহুদূর থেকে ভেসে আসে। বাজনাটা এসে ঘরের দরজায় একেবারেই থেমে যায় একরাশ ধোঁয়া ঘরে ঢোকে। বিস্মিত চোখে দেবব্রত গোস্বামী দেখতে পায়

ঘরের দরজায় লাইট জ্বেলে এসে দাঁড়িয়েছে সাতাশ বছর আগেকার-শঙ্কর মিত্র।]

শুক্র : কে!

শঙ্কর : আমি।

শুক্র : শঙ্কর?

শঙ্কর : হ্যাঁ।

শুক্র : এতোরাতে!

শঙ্কর : দেবব্রত?

শুক্র : বলো?

শঙ্কর : এসো আমার সঙ্গে।

শুক্র : কোথায়?

শঙ্কর : আমার ঘরে।

শুক্র : তোমার ঘরে!

শঙ্কর : হ্যাঁ।

শুক্র : কেন?

শঙ্কর : আমার অনুরোধ।

শুক্র : কি হয়েছে বলো?

শঙ্কর : শুভ্রাকে আকণ্ঠ মদ গিলিয়ে জোর করে বেহুঁশ করেছি—আমি আজ একটুও মদ খাইনি।

শুক্র : কি! কি বলতে চাইছো তুমি! কি বলতে এসেছো!

শঙ্কর : সেদিন যা বলেছিলাম।

শুক্র : শঙ্কর!

[দেবব্রত গোস্বামীর কণ্ঠে চাপা আর্তনাদ।]

শঙ্কর : আমাকে বাঁচাও তুমি দেবব্রত—তুমি শুধু আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুই নও দেবব্রত, আমার-আত্মীয়ের চেয়ে বেশী তুমি, আমার ভাই নেই—

তোমার ঈশ্বরের নামে দিব্যি করে বলছি, নিজের ছোট-ভাইয়ের চেয়েও অনেক বেশী ভালোবাসি তোমাকে আমি—আমার অনুরোধ—আমাকে বাঁচাও।

গুরু: আঃ! আঃ! আঃ!

[দেবব্রত গোস্বামীর পায়ের তলাকার মাটি-কাঁপছে থরথর করে।]

শঙ্কর: এসো।

গুরু: পাপ! পাপ—শঙ্কর—এতবড়ো পাপ যা ভাবতেই আমার শরীর কেঁপে উঠ্ছে—কি করে তুমি উচ্চারণ করছো?

শঙ্কর: পাপ নয় দেবব্রত—এ প্রয়োজন। আমার এতো অর্থ, এতো সম্পত্তি কে ভোগ করবে? আমি চাই না—আমি চাই না দেবব্রত আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার সব কিছু বারোভূতে লুটে খাক—আমি সন্তান চাই—আমার স্ত্রী শুভ্রা যাকে আমি নিজের চেয়েও বেশী ভালোবাসি তার গর্ভে তোমার ঔরসে সন্তান চাই সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা যে আমার নেই দেবব্রত—আমি ভিক্ষে চাইছি—ভিক্ষে—

গুরু: শঙ্কর! শঙ্কর! তুমি পাগল—তোমার প্রলাপ বন্ধ করো।

শঙ্কর: না দেবব্রত—এ প্রলাপ নয়—আমি পাগল নই—একফোঁটা মদ আমি আজ খাইনি—সুস্থমস্তিষ্কে এই গভীর রাতে তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে আমি এসেছি—আমাকে বাঁচাও—শুভ্রা মা হতে চায়—আমি চাই সন্তান—আমি আর তুমি ছাড়া পৃথিবীর তৃতীয় কেউ জানতে পারবে না একথা—শুভ্রাও নয়—তোমার ঈশ্বরের দিব্যি দেবব্রত—কেউ জানবে না।

গুরু: জানবে ঈশ্বর—তাঁকে ফাঁকি দেবে কি করে?

শঙ্কর: তুমি তো জানোই আমি ঈশ্বর মানি না?

গুরু: বিবেক। তোমার বিবেক?

শঙ্কর: আমার বিবেকেরই নির্দেশ।

গুরু : কিন্তু আমার নয়—আমি পারবো না—এতোবড়ো পাপ তুমি চলে যাও—

শঙ্কর : ভুল দেবব্রত ভুল—কতোবার বলবো তোমাকে এ পাপ নয় এ প্রয়োজন—রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইতিহাস দেখো—আমি তোমার ঈশ্বরের নামে দিব্যি করে বলছি দেবব্রত আমি ভুলে যাবো—আমি ভুলে যাবো আজকের কথা—তোমাকেও ভুলতে হবে—শুভ্রা জানবে—পৃথিবীর সবাই জানবে—সে মা হয়েছে—আমার সন্তান হয়েছে, আমি বাবা হয়েছি—আমরা সুখী হয়েছি—এসো—এসো—

[তার হাত ধরে অনুনয়ের সুরে শঙ্কর বলে।]

গুরু : ঈশ্বর! ঈশ্বর! অন্ধকার—অন্ধকার—জমাট—অন্ধকার দিয়ে আমাকে ঢেকে দাও—পায়ে দড়ি বেঁধে নরকের গভীর ফাঁদ আমাকে টেনে নামাচ্ছে আমার বন্ধু—আমার ভাই—আমায় মৃত্যু দাও—মৃত্যু চাই আমি—মহামৃত্যু!

[একবার অন্ধকার হয়েই আবার একটু একটু করে আবছা লাল আলোয় ঘর আলোকিত হলো। কিছুক্ষণ আগেকার মতোই ঘরে রয়েছেন দুই গুরুদেব। একজন শুয়ে রয়েছেন চাদরে সর্বশরীর ঢেকে আর একজন দাঁড়িয়ে—আছেন ঘরের এক কোণে। একটা অদ্ভুত বাজনা পুনরায় বহুদূর থেকে ভেসে আসে। বাজনা এসে বাইরের দরজায় থেমে যায়। গুরুদেব এবার দেখতে পান একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে অবিনাশ পণ্ডিত। প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার একরাতের ঘটনা।]

অবিনাশ : গোস্বামী।

গুরু : কে!

অবিনাশ : আমি—অবিনাশ পণ্ডিত।

গুরু : আপনি আমার কাছে—এতোরাতে!

অবিনাশ : সব রাস্তা হারিয়েছি আমি গোস্বামী—এই একটা রাস্তাই খোলা আছে জেনে এতো রাতে এখানে চলে এসেছি।

গুরু : কেন এসেছেন বলুন ?

অবিনাশ : আমাকে তুমি বাঁচাও গোস্বামী—আমাকে বাঁচাও !

গুরু : আমি ! আমি আপনাকে বাঁচাবো।

অবিনাশ : হ্যাঁ—একমাত্র তুমিই আজ আমাকে বাঁচাতে পারো গোস্বামী—পাপের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি আমি—আমাকে বাঁচাও।

গুরু : কি হয়েছে আপনার ?

অবিনাশ : সামাজিক কলঙ্কের হাত থেকে তুমি ছাড়া আমাকে আজ কেউ বাঁচাতে পারবে না গোস্বামী।

গুরু : কি হয়েছে খুলে পরিষ্কার করে বলুন ?

অবিনাশ : অরুন্ধতী—অরু—আমার একমাত্র মেয়ে অরু—

গুরু : কি হয়েছে তার ?

অবিনাশ : সে মা হয়েছে।

গুরু : এতে কলঙ্কের কি আছে !

অবিনাশ : সে কুমারী।

গুরু : অ্যাঁ !

অবিনাশ : শৈবাল—শৈবাল—বিলেত থেকে ফিরলেই তার সঙ্গে বিয়ে হবে অরুর—সব ঠিক হয়ে আছে তিন বছর আগে থেকে—সামাজিক কলঙ্কের হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও গোস্বামী।

গুরু : কে তার সর্বনাশ করেছে ? [কয়েক মুহূর্ত নিরুত্তর থেকে অবিনাশ অস্ফুটে বলে]

অবিনাশ : আমি।

গুরু : আপনি ! আপনি !

অবিনাশ : হ্যাঁ—আমি—একদিন এক দুর্বল মুহূর্তে আমি—আমি তার বাবা—তাকে আমি ধর্ষণ করেছিলাম।

গুরু : ওঃ! ওঃ! ভূমিকম্প! ভূমিকম্প! একটা বিরাট—ভূমিকম্প চাই এই মুহূর্তে—এই জগতের সমাজব্যবস্থা ভাঙতে বিরাট একটা ভূমিকম্প চাই—আমি—আমি—

অবিনাশ : আমাকে বাঁচাও।

গুরু : আমি কি করে আপনাকে বাঁচাবো!

অবিনাশ : সামাজিক কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচতে নিজের দেশ ছেড়ে তাকে নিয়ে নাগপুরে পড়ে আছি আমি—কেউ জানে না—তোমার আশ্রমে নিষ্পাপ শিশুকে তুমি আশ্রয় দাও গোস্বামী—যতদিন বাঁচবো তোমার চাকর হয়ে থাকতেও রাজী আছি—

গুরু : যদি না দিই?

অবিনাশ : তাহলে আমাদের তিনজনকেই আজ আত্মঘাতী হয়ে সামাজিক কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচতে হবে—বেঁচে সমাজের মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো সাহস আমার নেই গোস্বামী। দয়া—একটুখানি দয়া করো তুমি—তুমি সন্ন্যাসী—এ তোমার আশ্রম—আশ্রমে একটা অনাথ শিশুর আশ্রয় হবে না গোস্বামী?

[কয়েক মুহূর্তে চিন্তা করে গুরুদেব বলেন।]

গুরু : নিষ্পাপ শিশুর ভার আমি নিলাম।

অবিনাশ : গোস্বামী! গোস্বামী! তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না—আমি তোমার নাম প্রচার করবো—তোমার আশ্রম বিরাট করে দেবো—যতো অর্থ চাই—আমি দেবো—আমার মতো মহাপাপীকে দীক্ষা দিতে বলে তোমাকে আমি ছোটো করবো না—দূর থেকে আমি তোমার শিষ্য হয়ে রইলাম।

[গুরুদেব একেবারেই নিরুত্তর। দরজা অবধি গিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলে অবিনাশ পণ্ডিত।]

আমি কিন্তু তোমার কথা নিয়ে যাচ্ছি গোস্বামী পৃথিবীর কেউ কোন দিনও একথা জানবে না।

গুরু : আমি সন্ন্যাসী।

[অবিনাশ পণ্ডিত খুশীমনে চলে যায়। গুরুদেব অশান্ত]

ঈশ্বর! ঈশ্বর! ধ্বংস করো—ধ্বংস করো এ সমাজ—ধ্বংস করো এর প্রতিটি মানুষকে—ধ্বংস করো আমাকে।

[একবার অন্ধকার হয়েই আবার ঘর আলোকিত হয়। দেবব্রত গোস্বামী আর ঘরে নেই। সর্বাঙ্গ চাদরে ঢাকা গুরুদেব আনন্দ গোস্বামী উঠে বসেছেন খাটের উপর। শুধুমাত্র চোখে দুটো ছাড়া তার সর্বদেহ সেই কালো চাদরে ঢাকা।]

ঈশ্বর—ঈশ্বর—ভূমিকম্প — আগ্নেয়গিরি— বন্যা—মহামারী—দুর্ভিক্ষ—বজ্র দিয়ে ধ্বংস করো এ সমাজ—একে নিশ্চিহ্ন করো—আমাকে উন্মাদ করো —আমি ভুলতে চাই ঈশ্বর—আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবকিছু ভুলতে চাই—আমাকে ভুলিয়ে দাও—আমার সবকিছু ভুলিয়ে দাও—দয়া করো—আমাকে দয়া করো।

[ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে শুভ্রা।]

শুভ্রা : কে! কে!

গুরু : আমি। আমাকে দেখে ভয় পেয়েছো শুভ্রা? কালো চাদরে সর্বশরীর ঢাকা—ঘর অন্ধকার—জাগো শুভ্রা, জাগো, পৃথিবীর যতো কিছু কালো আছে সব দিয়ে এ চাদর তৈরী—এ আমার পোশাক—আমি সম্রাট—অন্ধকারের সম্রাট।

[গুরুদেব হেসে উঠেন। শুভ্রা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়।]

জাগো শুভ্রা, এ ভূতুড়ে ঘর—এ ঘরে আজ সাতাশ বছর আগেকার

শঙ্কর মিত্র এসেছিলো—পঁচিশ বছর আগেকার অবিনাশ পণ্ডিত এসেছিলেন—এ ঘরে এক্ষুনি বাজ পড়বে—ভয়ঙ্কর শব্দ করে এ ঘর ধ্বংস হয়ে যাবে—পড়ে থাকবে শুধু এর ধ্বংসস্তূপ—ধ্বংস্তূপের রাজা আমি—অন্ধকারের সম্রাট।

[হাসতে হাসতে খাটের তলা থেকে একটা দামী মদের বোতল বার করেন গুরুদেব।]

শুভ্রা : কি! কি ওটা?

গুরু : অমৃত।

শুভ্রা : কোথায় পেলেন!

গুরু : একদিন শঙ্কর আমাকে এটা দিয়ে বলেছিলো—এ নাকি সব জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিতে পারে—অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের জ্বালা ভুলিয়ে মানুষকে এক অদ্ভুত স্বপ্নময় রাজ্যে নিয়ে যাবার ক্ষমতা নাকি এর আছে—আজ পরীক্ষা করে দেখবো—এ আমাকে কোথায় নিয়ে যায়—জ্বালা যন্ত্রণা হতাশা ব্যর্থতা বেদনা বঞ্চনা প্রতারণার বেড়া ডিঙিয়ে এ আমাকে স্বপ্নের জগতে নিয়ে যেতে পারে কিনা আজ দেখবো—পাপ অপরাধ কালোর জগত থেকে সুখশান্তি তৃপ্তি আনন্দের সোনালী জগতে এ আমাকে নিয়ে যেতে পারে কিনা দেখবো—আমার ভাই—আমার আত্মীয় শঙ্কর আমাকে ভালোবেসে এটা দিয়ে গেছে—

শুভ্রা : শঙ্কর! শঙ্কর! শঙ্কর দিয়েছে—গুরুদেব—গুরুদেব!

গুরু : একটা কাজ আমার এখনো বাকি রয়েছে শুভ্রা—সে কাজ আমাকে করতেই হবে—আমার শেষ কাজ।

শুভ্রা : শেষ কাজ। কি বলছেন আপনি গুরুদেব!

গুরু : হ্যাঁ শেষ কাজ—ডাকো, গৌতমকে ডাকো, রশ্মিকে ডাকো,—আমি—আমি গুরুদেব নই—আমি আনন্দ গোস্বামী নই—আমি—আমি দেবব্রত গোস্বামী—আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গৌতম রশ্মির বিয়ে দেবো।

শুভ্রা : গুরুদেব !

গুরু : আমার অনুরোধ শুভ্রা ওদের ডেকে দাও—তারপর—অন্ধকারে মিলিয়ে যাবো—জমাট অন্ধকারে—রাশি রাশি ধোঁয়া দিয়ে সব পথ তুমি বন্ধ করে দিয়ো শুভ্রা—কেউ যেন আমাকে খুঁজে না পায়।

শুভ্রা : গুরুদেব !

গুরু : যাও—ওদের ডেকে আনো—আমার শেষ অনুরোধ তুমি রাখবে না শুভ্রা ?

শুভ্রা : না। এ বিয়ে হবে না—কিছুতেই হবে না—আমি বেঁচে থাকতে নয়।

গুরু : হবে না ! এ বিয়ে হবে না !

শুভ্রা : না—না—না।

[মঞ্চে নেমে আসে জমাট অন্ধকার]।

॥ বারো ॥

[অন্ধকার মঞ্চ একটু একটু করে আলোকিত হয়। গৌতমের ঘর। জানলায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে গৌতম। পা টিপে টিপে ঘরে এসে ঢোকে রশ্মি। গৌতমকে ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সামান্য হেসে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দুহাত দিয়ে তার চোখ টিপে ধরে। গৌতম চমকে উঠে, বেশ একটু ভয় পেয়েছে বলেও মনে হয়।]

গৌতম : কে ? কে ?

রশ্মি : আমি গো, আমি।

গৌতম : রশ্মি।

রশ্মি : কোন জগতে ছিলে তুমি এতক্ষণ? ফিলজফি তোমার মুণ্ডুটি একেবারে চিবিয়ে খেয়েছে—শোন যা বলতে এসেছি—আজ রাতে আমরা পালাবো।

[খুউব আস্তে কথা বলে রশ্মি। গৌতম আর একবার চমকায়।]

গৌতম : আজ রাতে।

রশ্মি : হ্যাঁ—আচ্ছা, অতোশতো কি ভাবছো বলো তো?

গৌতম : না, কিছু না।

রশ্মি : তোমার কিছু না তো? সেও এক বিরাট কিছু—এতদিনেও তোমার চিনিনি বলতে চাও? ওঃ! কি মজা—কি আনন্দ হচ্ছে আমার—আমার না শুধু নাচতে ইচ্ছে যাচ্ছে—কি ইচ্ছে করছে জানো? ইচ্ছে করছে শুধু তোমায় জড়িয়ে ধরে নাচি—নেচে নেচে পাহাড় পর্বত নদী নালা সব ডিঙিয়ে অনেক দূরের দেশে চলে যাই। হ্যাঁ শোন, সঙ্গে কিন্তু আমরা এমনি কিচ্ছু নেবো না—মায়ের বাকস্ থেকে অনেক টাকা সরিয়ে রেখেছি আমি—গয়নাও অনেক আছে—যতদিন না তোমার একটা চাকরি হয় আমাদের হেসে খেলে চলে যাবে—সস্তা হোটেলে উঠবো—প্রথমে একটু কষ্ট করি—পরে আরাম করবো—এ পোশাকটা কিন্তু তুমি দয়া করে পালটে নিও—গুরুদেব ঘুমুলেই আমরা পালাবো—তোমার ভয় করেছে নাকি—অ্যাঁ? হুঁ—হাঁ কিছুই করছো না যে? দেখছো কি অমন করে? তাকাচ্ছো কেন ওমনি ভাবে? মুখটা যে একেবারে ফ্যাকাশে মেরে গেছে; জানিনা বাবু তোমাদের ব্যাপার; গুরুদেব কেমন গম্ভীর হয়ে গেছেন—মা কেমন হয়ে গেছে—তুমি একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছো—আমি কিন্তু খুউব খুশী—তোমায় দেখছি ঠোঁট কাঁপছে—পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—কি ভীতু তুমি—সারাজীবন তোমায় ঠিকভাবে চালাতে যে আমার হিমসিম খেতে হবে। বকাগুণ্ডাকে মনে আছে তোমার? না, তোমার মনে থাকবে কি করে? তুমি তো তখন বেনারস ইউনিভারসিটিতে গিয়েছিলে—কি ভীষণ গুণ্ডা—

ইয়া বড়োবড়ো দুটো লাল চোখ—গুরুদেবের পায়ের ওপর বিরাট একটা ছোরা রেখে লুটিয়ে পড়লো—কি কান্না—আমি দরজার দাঁড়িয়ে চুপটি করে সব দেখছি—একেবারে পালটে গেলো তারপর থেকে—ভালোমানুষ হয়ে গেলো—ওর সেই ছোরাটা না আমার কাছে আছে—সঙ্গে করে নিয়ে নেবো, কি বলো ? বলা তো যায় না বা হাবা ভোম্বল দাস তুমি তোমাকেই কেউ চুরি করে নিয়ে না পালায়—আমি আসছি, তুমি তৈরী হয়ে নাও—একটুও ভয় পেও না—আমি তো রয়েছি।

[রশ্মি বাইরে চলে যায়। গৌতম ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে বলে মনে হয় না। সে ঘরের লাইট নিভিয়ে দেয়। অন্ধকার ঘরে বাইরের জানলা আর দরজা দিয়ে বারান্দার কিছুটা আলো এসে ঢুকেছে। সেই আবছা আলোতে দেখতে পাওয়া যায় গৌতম টলছে, সে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ঘরের দেওয়াল ধরে ধরে খাটের কাছে সে যেতে চায় কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। উঠবার চেষ্টা করে। অনেক কষ্টে কাঠের নাগাল পায়। সে শোয় তার বিছানায়। তাকে দেখে মনে হয় যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। খুউব আস্তে আস্তে সে বলে]

গৌতম : গুরুদেব! গুরুদেব! রশ্মি! রশ্মি! মা! মা! বাবা! বাবা! রশ্মি! মা! বাবা! রশ্মি! রশ্মি! রশ্মি!

[বিছানায় সে ফুলে ফুলে ওঠে। তারপর শান্ত হয়ে যায়। সেই আবছা অন্ধকারেই পা টিপেটিপে ঘরে এসে ঢুকেছে রশ্মি। সিঁথিতে সিন্দুর দিয়ে ছাপাশাড়ী পরে বৌ সেজেছে রশ্মি। অপূর্ব মানিয়েছে তাকে। কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ]

রশ্মি : ঘুমোচ্ছো! কি কাণ্ড! আমি তৈরী হয়ে এলাম আর তুমি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছো ? গুরুদেব ঘুমোচ্ছেন মা ঘুমোচ্ছে গোটা পৃথিবী ঘুমোচ্ছে —সবাই জেগে উঠবার আগে পালাই চলো—গৌতম—অ্যাই—অ্যাই—

বাবাঃ! বাবাঃ! কি ঘুম! কি ঘুম! না, এ দেখছি আমায় সারাজীবন ধরে জ্বালাবে—আচ্ছা লোককে ভালোবেসেছি।

[রশ্মি আলো জ্বালায়। এগিয়ে এসে ধাক্কা দেয় গৌতমকে।] ওঠো না গো? ওঠো—

[পরমুহূর্তেই বিরাট একটা আর্তচীৎকার করে গৌতমের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রশ্মি।]

গৌতম! গৌতম। গৌতম!

[কান্নায় ভেঙে পড়েছে রশ্মি গৌতমের বুকের ওপর।] মা—মা—মা—মা—

[তার চীৎকারে ছুটে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে শুভ্রা।]

শুভ্রা: কি—কি হয়েছে—কি হয়েছে? অমন করছিস কেন? কি হয়েছে?

রশ্মি: মা—মা—গৌতম—মা—

শুভ্রা: কি হয়েছে—গৌতমের কি হয়েছে—বল কি হয়েছে?

রশ্মি: মরে গেছে—তোমার ছেলে মরে গেছে—মা!

শুভ্রা: রশ্মি!

[উঁচু গলায় 'রশ্মি' বলে চীৎকার করে উঠে একেবারে পাথর হয়ে যায় শুভ্রা। অঝোরে কাঁদছে রশ্মি। বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন গুরুদেব। রশ্মি গুরুদেব পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। গুরুদেবের দৃষ্টি শান্ত, রশ্মির জ্বলন্ত—দুজনের একজনেরও দৃষ্টি কিন্তু স্বাভাবিক নয়। ছোরাটা বের করেছে রশ্মি তার কাঁধের ঝোলানো ব্যাগের ভেতর থেকে।]

গুরু: আমি—হ্যাঁ—আমি মেরেছি ওকে—দে, আমাকে শাস্তি দে—দে ওটা আমার বুকে বসিয়ে—আয়—আয়, দে বসিয়ে, বুঝবো কতো ভালোবাসিস তুই তোর গৌতমকে?

[খোলা ছোরা নিয়ে এগিয়ে আসে রশ্মি। অশান্ত হয়ে উঠছেন গুরুদেব।]

যে বিষাক্ত মন নিয়ে বুদ্ধির পূজো করতে গিয়ে মনের ধ্বংস ডেকেছি আমি, আমাকে শাস্তি দে—জঙ্গলের রাজা আমি, আমি চেয়েছিলাম জঙ্গল পরিষ্কার করতে, আমাকে শাস্তি দে—নরকের সম্রাট আমি, আমি চেয়েছিলাম স্বর্গ গড়তে, আমাকে শাস্তি দে—সংক্রামক রোগের পর্বত এটা, একে তুই উপড়ে ফেল রশ্মি—আমাকে তুই মুক্তি দে।

[গুরুদেব আর রশ্মির ব্যবধান মাত্র একহাত। অপলক দৃষ্টিতে গুরুদেবের চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিলো রশ্মি। গুরুদেবের চোখেও আজ জল। তাঁর কথা শেষ হলে গুরুদেবকে স্তম্ভিত করে নিজের বুকেই ছোরাটা আমূল বিঁধিয়ে দিলো রশ্মি। একসঙ্গে আর্তচীৎকার করে ওঠেন গুরুদেব ও শুভ্রা।]

গুরু : রশ্মি! রশ্মি!

শুভ্রা : রশ্মি! রশ্মি!

[আর্তনাদ করেনি রশ্মি, কোন কাতরোক্তিও নেই। মুহূর্তে সে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো গৌতমের ওপর। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গৌতমের খাটের সাদা চাদর। বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে শঙ্কর মিত্র।]

গুরু : শঙ্কর! শঙ্কর! দেখো—দেখো—ভালো করে দেখো—স্বর্গ গড়েছে ওরা—আমি পালাচ্ছি—আমি পালাচ্ছি এখান থেকে—এ স্বর্গ ওরা গড়েছে—এখানে একমুহূর্ত থাকবার অধিকার আমার নেই—আমি পালাই—আমি পালাই—তুমিও পালাও শুভ্রাকে নিয়ে—পালাও পালাও।

[ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো শঙ্কর ঘরের এ' দৃশ্য দেখে। কথা বলার শক্তি সেও হারিয়ে ফেলেছে। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দুজনকে দেখে শঙ্কর—দুচোখ তার জলে ভরে গেছে। তাকে উদ্দেশ্য করে গুরুদেব

যা বললেন সে তার একটা শব্দও শুনতে পায়নি। গুরুদেব পালাচ্ছিলেন হঠাৎ শঙ্করের বিদ্রূপমিশ্রিত 'গুরুদেব' ডাকে তিনি থমকে দাঁড়ান]

শঙ্কর : গুরুদেব !

গুরু : কে গুরুদেব ? কার গুরুদেব ? গুরুদেব মরে গেছে—আমি দেবব্রত গোস্বামী, সমাজের শত্রু, পৃথিবীর শত্রু—অন্ধকারের রাজা—নরকের সম্রাট —এ স্বর্গ—পালাও পালাও।

[গুরুদেব পালালেন। শঙ্কর শুভ্রা দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। শঙ্করের দুচোখ দিয়ে জল পড়ছে। শুভ্রার দুঠোঁট কাঁপছে থর থর করে। এগিয়ে এসে সে শঙ্করের বুকে মুখ লুকিয়ে ছোট্ট মেয়ের মতো কান্নায় ভেঙে পড়ে।

শুভ্রা : শঙ্কর ! শঙ্কর ! গৌতম ! গৌতম !

শঙ্কর : কেঁদো না শুভ্রা—কেঁদো না—লাইফ্ গিভেন্ বাই দি অলমাইটি ক্যান্ বি টেকেন্ ব্যাক্ অ্যাট্ এনি মোমেনট্—কেঁদোনা—বাঘ সিংহ গণ্ডার শেয়াল শকুন গাধার মেলায় ওরা একজোড়া রঙীন প্রজাপতি—কি চমৎকার মানিয়েছে দুজনকে দেখো কি অপূর্ব দৃশ্য দেখো—কাঁদছো কেন বোকার মতো ? হাসো—হাসো—হাসো।

[শঙ্কর মিত্র সান্ত্বনা দেয় শুভ্রাকে কিন্তু তার দুচোখেও জলের রেখা। মঞ্চে নেমে আসে জমাট অন্ধকার।]

। কথা শেষ ।

[প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ দৃশ্য। আবছা অন্ধকার ঘরে গুরুদেব একা বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টিটা কেমন যেন ঘোলাটে। অদ্ভুত একটা বাজনা তাঁকে ঘিরে বাজছে। সেই সঙ্গে তাঁকে ঘিরে ধরেছে একটা সবুজ আলো। ঘরে এক অবাস্তব পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিস্ফারিত চোখে গুরুদেব দেখতে পান প্রবাল-শ্রাবণী, চম্পক-অজন্তা, শঙ্কর-শুভ্রা এসে ঘরে ঢুকেছে এবং তাঁকে ঘিরে তারা হাসছে। গুরুদেবের বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় নব-বিবাহিত গৌতম-রশ্মি এসে যখন দাঁড়িয়েছে ভেতরের দরজায়। সবাই মিলে তাঁকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। তারা হাসে, গুরুদেবকে ব্যঙ্গ করে হাসে হাসির শব্দ যখন তীব্র হয় তখন ক্ষিপ্ত গুরুদেব চীৎকার করে ওঠেন।]

গুরু : আগুন—আগুন—শুভ্রা—শঙ্কর—চুমকি—মানকে—আগুন—আগুন নিয়ে আয়—জ্বালিয়ে দে জ্বালিয়ে দে এই ভণ্ডের পচা ধর্মশালা জ্বালিয়ে দে।

[সবাই মিলিয়ে যায়। ঘরের স্বাভাবিক পরিবেশে চুমকি মানকে শঙ্কর শুভ্রা ছুটে এসেছে।]

আগুন এনে জ্বালিয়ে দাও— ধ্বংসস্তুপের শোভা দেখবো আমি—দাও জ্বালিয়ে—আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না তোমরা? আগুন কোথায়, আগুন?

মানকে : জ্বালিয়ে দিলে আমরা কোথায় থাকবো বাবা ?

চুমকি : কোথায় যাবো বাবা আমরা?

গুরু : অ্যাঁ! অ্যাঁ।

[কিছুটা শান্ত হয়েছেন গুরুদেব। হঠাৎ শঙ্করের দিকে তার চোখ পড়তেই খেঁকিয়ে ওঠেন।]

অমন করে তাকিয়ে আছো কেন আমার দিকে? ধোঁয়া ওঠা ঘেঁয়ো কুকুর দেখছো নাকি? দেখো—দেখো—দুচোখ ভরে দেখে নাও—বিষ—আমার সর্বাঙ্গে বিষ—আমার নিঃশ্বাসে বিষ—দেখো-দেখো, চোখ ঝলসে যাবে।

[শুভ্রা ইতিমধ্যে শঙ্করের ইঙ্গিতে গুরুদেবের জন্য ঘুমের অষুধ নিয়ে এসেছে সে এবার ইঙ্গিতে চুমকি মানুকেকে ভেতরে যেতে বলে। ওরা দুজনে চলে যায়।]

শঙ্কর : এটুকু খেয়ে নাও।

[গুরুদেব ফ্যালফ্যাল করে বোবার মতো শঙ্করের দিকে তাকায়]।

খাও।

[গুরুদেব তার কথার অবাধ্য হতে পারে না। অষুধ খায়। শঙ্কর গিয়ে দাঁড়ায় জানলার সামনে। শুভ্রা গুরুদেবের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।]

গুরু : যন্ত্রণা—অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে শুভ্রা—মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে—আমি ক্ষিপ্ত হতে চাই, পারছি না—আমি উন্মাদ হতে চাই, পারছি না—অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবকিছু ভুলতে চাই, পারছি না—ছদ্মবেশ খুলে নিজের বেশে পথেঘাটে অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতে চাই, পারছি না—তোমরা—তুমি আমাকে বন্দী করেছো—শঙ্কর আমাকে বন্দী করেছে—চুমকি মানুকে আমাকে বন্দী করেছে—নিজের শেকলে নিজেই বাঁধা পড়েছি আমি শুভ্রা বড্ডো ভার—বড্ডো ভার। ঘুম আসছে—বুঝছি—সব ভুলে যাচ্ছি—স্মৃতির পাতা মুছে যাচ্ছে—সব বাঁধন খুলে যাচ্ছে—সব জট ছেড়ে যাচ্ছে—শেকল ভেঙে পড়ছে—মুক্ত হচ্ছি—আমি মুক্ত হচ্ছি শুভ্রা—আলো—আলো—শঙ্কর—শঙ্কর—আলো—আলো—

[শঙ্কর সামনে এসে দাঁড়ায়।]

একটি আলোর রেখা ধরে অনেক আলোর রাজত্বে আমাকে নিয়ে যাবে তুমি শঙ্কর? বলো, বলো শঙ্কর, আমাকে তুমি নিয়ে যাবে?

শঙ্কর : যাবো।

গুরু : আঃ।

[ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে। আলোর রেখা শুধু গুরুদেবের মুখে। আর একটা সূক্ষ্ম সরু আলোর রেখা গিয়ে পড়েছে ভেতরের দরজায় একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়ানো গৌতম-রশ্মির মুখে। মঞ্চ ঘন অন্ধকারে ঢেকে যায়। নেমে আসে 'অবতার' নাটকের যবনিকা।

॥ যবনিকা ॥

॥ লিপিকা'র প্রকাশিত নাটক ॥

রাজাবদল—জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়
সমুদ্রশঙ্খ - রতন ঘোষ
মসনদ—শক্তিপদ রাজগুরু
হে মোর পৃথিবী—সমর মুখোপাধ্যায়
উৎসর্গ—সলিল সেন
অবতার—শচীন ভট্টাচার্য
প্রতিবাদ—রতন ঘোষ
দ্রৌপদী —জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ছোটদের নাটক ॥

রাজসিক—সম্রাট সেন
কথামালার দেশ—শান্তিময় মৈত্র
স্বামী বিবেকানন্দ—সত্যবান